# তাওহীদের ডাক

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪

## ভারতীয় পানি আগ্রাসন : বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৭
- পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
- ত্যাগের মহিমায় চিরভাস্বর ঈদুল আযহা : আমাদের করণীয়
- আল্লাহই পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক
- সিন্ধুতীরের করাচিতে
- নারীবাদী লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম

## গুম-খুন-অপহরণ : আতঙ্কিত দেশবাসী

Contents

The Call to Tawheed

# তাওহীদের ডাক

১৯তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪

**উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
মুযাফফর বিন মুহসিন
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

**সম্পাদক**
আব্দুর রশীদ আখতার

**ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
আব্দুল্লাহিল কাফী

**সহকারী সম্পাদক**
বযলুর রহমান

**যোগাযোগ**
**তাওহীদের ডাক**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র

➪ সম্পাদকীয় ২
➪ কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা ৪
➪ আক্বীদা ৬
ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৭
মুযাফফর বিন মুহসিন
➪ তারবিয়াত ১০
পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার *(শেষ কিস্তি)*
বযলুর রহমান
➪ ধর্ম ও সমাজ ১৬
ত্যাগের মহিমায় চিরভাস্বর : ঈদুল আযহা ও আমাদের করণীয় *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
➪ সাময়িক প্রসঙ্গ ২২
ভারতের পানি আগ্রাসন ও আমাদের করণীয়
মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
➪ চিন্তাধারা ২৭
গুম-খুন-অপহরণ : আতংকিত দেশবাসী
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
➪ আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩১
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
➪ পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে ৩৩
আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
➪ পরশ পাথর ৩৬
নারীবাদী লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
➪ তারুণ্যের ভাবনা ৩৮
আল্লাহই পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক
মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
➪ ভ্রমণস্মৃতি ৪০
সিন্ধুতীরের করাচীতে *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
➪ আলোকপাত ৪৬
➪ সংগঠন সংবাদ ৪৯
➪ আইকিউ ৫৬

# সম্পাদকীয়

## (ক) হক্বের আগমন, বাতিলের মূলোৎপাটন

হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। হক্ব চিরদিন বিজিত। বাতিল চিরদিন পরাজিত। অনেক সময় বাতিলের আস্ফালন লক্ষ্য করা গেলেও তার চূড়ান্ত ফল হয় শোচনীয় পরাজয়। এটাই আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ বলেন, 'হক্বের আগমন ঘটেছে, বাতিলের মূলোৎপাটন হয়েছে। বাতিল মূলোৎপাটিত হওয়ারই যোগ্য' *(বানী ইসরাঈল ৮১)*।

শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতে আক্রান্ত মুসলিম সমাজে যখন অভ্রান্ত অহির প্রদীপ্ত কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তখন বাতিলের ধ্বজাধারীরা ক্রোধ ও ত্রাসের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। হক্বের শুভাগমনে তারা ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ খানকা, মাযার আর দর্গায় প্রতিষ্ঠিত বিনা পূজির ধর্মীয় ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পেট পূজারী বকধার্মিক ধান্ধাবাজ বিদ'আতী আলেমরা মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানী ও চেহলামের যে প্রথা চালু রেখেছে, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মাযহাবী প্রতারণা, পীর-মুরীদী ধোঁকাবাজি, তরীকাতন্ত্রের লুকোচুরি, তাবলীগী ভেলকির আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। জাল ও যঈফ হাদীছের প্লাটফরম ও মিথ্যা তাফসীরের ব্যবসায়ী মঞ্চ ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাজনীতির দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্য মতবাদ গুলো যে শিরকী মন্ত্র এবং ঈমান বিধ্বংসী ভয়াবহ মারণাস্ত্র, তা সচেতন মহলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বলিষ্ট হুংকার সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। সকল শ্রেণীর মানুষ হক্বের দাওয়াত গ্রহণ করে মহা আনন্দে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে শামিল হচ্ছে। জাল ছালাত ছেড়ে ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করছে, শিরক মিশ্রিত ভ্রান্ত আক্বীদা প্রত্যাখ্যান করে বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করছে, চির অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট অসংখ্য ভ্রান্ত দল, পথ ও মত বর্জন করে সালাফীদের পথে সমবেত হচ্ছে, ফরমালিনযুক্ত যাবতীয় বিদ'আতী আমল ছুড়ে ফেলে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল চর্চা করছে। বিশেষ করে তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের অভাবনীয় পরিবর্তনটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনী শক্তি হিসাবে আগমন করেছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

উক্ত পরিবর্তনই বিদ'আতীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের সর্বত্রই শিরক-বিদ'আতের প্রতিনিধিত্বকারী কথিত মৌলভীরা এবং ভ্রান্ত দলের এজেন্টরা ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করেছে। মসজিদে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ করেছে। জোরে আমীন বলা যাবে না, বুকের উপর হাত বাঁধা যাবে না, রাফউল ইয়াদায়েন করা যাবে না বলে মসজিদে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। অনেক ভাইকে মসজিদে ধরে এনে দরজা বন্ধ করে সকলে মিলে নির্যাতন করেছে, মারপিট করে আহত অবস্থায় মসজিদের মেঝেতে ফেলে দিয়েছে। কখনো রাস্তা-ঘাটে, বাজারে লাঞ্ছিত করছে। জঙ্গী বলে থানায় রিপোর্ট দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। অনেককে বাড়ী ছাড়া করেছে। এমনকি রাতের গভীরে আগুন জ্বালিয়ে মসজিদ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। বুখারী, মুসলিম সহ অন্য হাদীছের গ্রন্থ মসজিদ থেকে বের করে ফেলে দিচ্ছে। বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করলে ছালাতরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা কথিত মূর্খ ইমাম ও চেয়ারম্যান-মেম্বার নামের কথিত সমাজ নেতাদের সামনেই অহরহ ঘটছে। কিন্তু তারা আবু জাহল, আবু লাহাব ও উতবার ন্যায় উৎসুক ভূমিকা পালন করছেন। তারা কখনো যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেন না। তারা নমরুদ, ফেরাউন, হামান, কারুনদের ইতিহাস ভুলে গেছেন। দুইদিনের ক্ষমতা পেয়ে কবর, ক্বিয়ামত ও জাহান্নামের কথা মনে করেন না। ইহূদী-খ্রীষ্টান ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বানানো ট্যাবলেট সেবন করে তারা মাতাল হয়ে গেছেন।

আমরা নির্যাতিত ঐ সমস্ত দ্বীনী ভাইদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলব, ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করুন, হেকমতের সাথে দলীল ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখুন। ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নেমে আসবে। ইসলামের শুরুর যুগে আম্মার (রাঃ)-এর পরিবারের উপর কাফের মুশরিকদের নির্যাতন দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর! নিশ্চয় তোমাদের স্থান জান্নাতে নির্ধারিত' *(হাকেম হা/৫৬৫৪, সনদ ছহীহ)*। বেলাল, আবু যার গেফারী, খুবাইব (রাঃ) সহ অন্যান্য নির্যাতিত ছাহাবীদের কথা স্মরণ করুন। তায়েফবাসী রাসূল (ছাঃ)-এর উপর যে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছিল সেটা মনে করুন আর দাওয়াতী কাজের প্রতি হৃদয়কে শক্ত করুন। বিজয় একদিন আসবেই ইনশাআল্লাহ। শুনুন আল্লাহ্র বাণী- 'আল্লাহ সত্যকে সত্য হিসাবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন। যদিও অপরাধীরা তা অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮)*। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত করি। যাতে সত্য মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়' *(আম্বিয়া ১৮)*। আমরা নির্যাতিত ভাইদের জন্য দু'আ করছি- আল্লাহ যেন তাদেরকে নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নেন এবং জান্নাতের সদস্য হিসাবে কবুল কের নেন-আমীন!

এক্ষণে দানশীল ভাইদের প্রতি আমাদের আবেদন, তারা যেন এই দুঃসময়ে দ্বীনী ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং আমাদের বই-পুস্তক, পত্রিকা, বক্তব্যগুলো বেশী বেশী প্রচারের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেন। যেমন ইসলামের ক্রান্তি কালে এগিয়ে এসেছিলেন আবুবকর, ওছমান, আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) সহ প্রমুখ ছাহাবী।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র শানে নিবেদন, তিনি যেন এদেশ থেকে শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় জাহেলী সভ্যতার শিকড় উপড়ে ফেলেন। তিনি যেন সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে হক্বের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন এবং হেদায়াত কবুল করার সৌভাগ্য প্রদান করেন। আল্লাহ যেন দুর্নীতিবাজ, দাম্ভিক, মিথ্যুক, প্রতারক, অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব ও শাসক থেকে মুমিন বান্দাদেরকে হেফাযত করেন। 'হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন' *(নিসা ৭৫)*। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে রহমত ও নিরাপত্তা নাযিল করুন-আমীন!!

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

## (খ) মুযাফফর বিন মুহসিনের গ্রেফতার

আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি। সকলের জন্য আইনের সমতা নিশ্চিতকরণ, সৎ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং স্বাধীন ও কার্যকরী বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ শান্তিপূর্ণ সমাজ কাঠামোর মৌলিক উপাদান। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটি ব্যর্থ হলে সমাজ হারায় তার স্বাভাবিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশের মাটিতে সেই শুরু থেকেই আইন, বিচার, প্রশাসন শব্দগুলো সত্যিকার অর্থে কখনই আপন স্থানে স্থিতি লাভ করতে পারেনি। ফলে স্বাধীনতা লাভের ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও সুশাসন ও ন্যায়বিচার নামক সোনার হরিণটি অদ্যাবধি অধরাই রয়ে গেছে এদেশের নিরীহ মানুষদের কাছে। যার নিত্য প্রকাশ আমরা আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। দুষ্টরা এখানে প্রতিপালিত হয় মহাযত্নে। আর শিষ্টরা হয় নির্মমভাবে অবদমিত। স্বয়ং রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী হিসাবে যারা পরিচিত, তারা মানুষকে নিরাপত্তা দেয়া তো দূরে থাক, উল্টো মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রানী করছে। যার নির্মম শিকার হয়ে অসহায় মযলূম মানবতা বিনা বিচারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে কারা অভ্যন্তরে। সাম্প্রতিক সময়ে জনৈক ইউপি চেয়ারম্যানের দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ ১৪ বছর কারাভোগের পর বাগেরহাট কারাগার থেকে যামিনে মুক্তি পান পিরোজপুর যেলার মুসলিম বিশ্বাস (৬০)। ১৮ বছর বিনা বিচারে কারা অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পান ঢাকার আনোয়ার হুসাইন। অপরদিকে ঠিকানা জটিলতার কারণে চট্টগ্রামের ৮০ বছরের বৃদ্ধ আব্দুল মালেক ১০ বছর যাবৎ কারাভোগ করেন। যা পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এ রকম জানা-অজানা অগণিত নিরপরাধ মানুষ মিথ্যা মামলায় বন্দী হয়ে নীরবে-নিভৃতে ডুকরে কাঁদছে! প্রশ্ন হল, বিনা বিচারে বন্দীত্ব বরণ করা এই সমস্ত মানুষের হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোর মূল্য কে দেবে? কে ফিরিয়ে দেবে তাদের হারিয়ে যাওয়া জীবনের মূল্যবান সময়? মযলূম মানবতা এই জবাবদিহিতা আজ কার কাছে চাইবে?

গত ৭ নভেম্বর ২০১৪ বেলা আড়াইটায় ঢাকার মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেওয়ার পর ছালাত শেষে বের হলে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) দু'জন কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে ডেকে নিয়ে যায় **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, 'যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**-এর সাবেক সম্পাদক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য, পিস টিভি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় আলোচক মুযাফফর বিন মুহসিনকে। অতঃপর ২ দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে তাঁকে সম্প্রতি নিহত 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেফতার দেখিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। আদালতে তাঁকে উপস্থাপন করা হয় কথিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে! পরদিন মিডিয়াতেও সেটা প্রচার করা হয় ফলাওভাবে। আমরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবিশ্বাস্য কাণ্ডকীর্তি। মিথ্যারও একটা সীমা থাকে, কিন্তু সেই সীমাকে অগ্রাহ্য করে দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী এক মহামিথ্যা কাহিনী ফেঁদে বসল। আর মিডিয়া গুলো সঙ্গে সঙ্গে সেটা লুফে নিল গোগ্রাসে। যামিন নামঞ্জুর করে রিমাণ্ড মঞ্জুর করা হ'ল ২ দিনের জন্য। রিমাণ্ড শেষ হওয়ার পর আদালতে হাযির করে পুনরায় রিমাণ্ড চাইল সরকারী বাহিনী। পক্ষান্তরে সংগঠনের পক্ষ থেকে চাওয়া হল যামিন। কিন্তু আদালত যামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করল। তারপর থেকে চলমান রয়েছে একের পর এক দৃশ্যপট। মামলাটি নাকি এতই চাঞ্চল্যকর যে, সন্দেহ হোক আর না হোক, কোর্ট তাতে যামিন দিতে পারবে না!... এভাবে আজো পর্যন্ত তিনি গাজীপুরস্থ কাসিমপুর কারাগারে অন্তরীণ আছেন!

অথচ আমাদের মাঝে অতি টাটকা হয়ে রয়েছে সেই দুর্বিষহ স্মৃতি। বিগত ২০০৫ সালে যখন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উপর অকস্মাৎভাবে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছিল তৎকালীন সরকার। যার বিষাক্ত নখরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ সংগঠনের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দসহ সংগঠনের নিরপরাধ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী। জঙ্গীবাদের নোংরা অপবাদ দিয়ে দেশ-বিদেশে সর্বত্র তাদেরকে চিত্রিত করা হয়েছিল ভয়ংকর দাগী অপরাধী ও দেশেদ্রোহী হিসাবে। দীর্ঘ সাড়ে তিনটি বছর ধরে কারারুদ্ধ করে রাখা হয় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের নামকে কলংকিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে। সেই ক্ষত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই 'যুবসংঘ'-এর সদস্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনকে ঠিক একইভাবে জঙ্গী অপবাদ দিয়ে জড়ানো হল আরেক মিথ্যা মামলায়। কারারুদ্ধ করা হল অন্যায়ভাবে। রচিত হ'ল দেশের আইন-আদালতের ইতিহাসে আরো একটি ন্যক্কারজনক কালো অধ্যায়।

সুধী পাঠক! ধারাবাহিকভাবে আমাদের উপর দেশের সরকারের এই নির্যাতন অব্যাহত থাকার পরেও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ব্যাপারে আমরা মোটেও বিচলিত নই। কারণ আমরা জানি হক্কের বিরুদ্ধে বাতিল সর্বদা খড়গহস্ত হবে। এটাই ইতিহাসের চিরন্তন বাস্তবতা। ইতিহাসের পাতায় পাতায় হক্কপন্থী আলেমগণের বিরুদ্ধে বাতিলের অন্যায় আক্রমণের হাযারো দৃষ্টান্ত এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে। মুযাফফর বিন মুহসিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি এ দেশের বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী ময়দানে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। সেই কণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য বাতিলপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি তাঁর এই গ্রেফতারের পিছনে কলকাঠি নেড়েছে এমনই একটি মাযারপূজারী গোষ্ঠী, যারা তার পীর-মাযার বিরোধী বক্তৃতা-লেখনীতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাই 'যুক্তি যেখানে অচল যষ্টি সেখানে সচল' নীতি অনুযায়ী মুযাফফর বিন মুহসিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতেছে তারা। আমরা কায়মনো বাক্যে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই সংকটে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করেন এবং দ্রুত সময়ে বিপদমুক্তির পথ খুলে দেন। সেই সাথে যে বা যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত তাদেরকে হয় হেদায়াত দান করেন অথবা তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন। আমীন! পরিশেষে আমাদের কামনা মুযাফফর বিন মুহসিনকে যালেমের কারাগার থেকে মুক্ত করে আবারো দুর্বার গতিতে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!!

# রহমত বা আল্লাহ্র অনুগ্রহ

**আল-কুরআনুল কারীম :**

১- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(১) 'অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/৩৭)*।

২- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(২) 'তবে যদি কেউ অছিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৮২)*।

৩- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

(৩) 'যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/২২৬-২২৭)*।

৪- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(৪) 'যারা আমার আয়াত সমূহে ঈমান আনার পরে যখন আপনার নিকট আসে তখন তাদেরকে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের প্রতিপালকের দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আন'আম ৬/৫৪)*।

৫- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(৫) 'বলুন! আমার প্রতি যে অহী হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না; মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় হয়ে উহা আহার করলে আপনার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

৬- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(৬) 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার' *(নূর ২৪/৫৬)*।

৭- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

(৭) 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা ইহা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*।

৮- وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(৮) 'অবশ্য আমি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলাম এমন এক কিতাব, যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া' *(আ'রাফ ৭/৫২)*।

৯- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(৯) 'আপনি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন না, তখন তারা বলে, তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বেছে নাও না কেন? বলুন, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমিতো শুধু তারই অনুসরণ করি, এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ' *(আ'রাফ ৭/২০৩-২০৪)*।

১০- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

(১০) 'যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'। এরাই তারা, যাতের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাইতো সৎপথে পরিচালিত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬-১৫৭)*।

**হাদীছে নববী থেকে :**

১১- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضى الله عنهما كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا.

(১১) উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাত ধরে তাঁর এক রানের উপর আমাকে বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর দু'জনকে একত্রে মিলিয়ে নিতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের দু'জনের প্রতি রহম করুন, কেননা আমি এদেরকে ভালবাসি' *(বুখারী হা/৬০০৩; মিশকাত হা/৬১৪০)*।

১২- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لاَ وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.

(১২) ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বলেন, এক সময় কয়েকজন বন্দী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল। বন্দীদের মধ্যে থেকে একজন নারী কেবলই অনুসন্ধানে রত ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোন

শিশুকে পাওয়া মাত্র তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে জড়িয়ে ধরে তাকে দুগ্ধ পান করাত। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এ মহিলা কি তার সন্তানদেরকে আগুনে ফেলতে রাযী হবে? আমরা বললাম, না। আল্লাহ্র শপথ! সে কোন সময় তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সন্তানের উপর এ মহিলাটির দয়া হতেও আল্লাহ বেশী দয়ালু *(মুসলিম হা/৭১৫৪; মিশকাত হা/২৩৭০)*।

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন মাখলূক্ব সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিখলেন এবং তিনি আপন সত্তা বিষয়ে লিখলেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর রক্ষিত আছে, 'আমার রহমত আমার গযবকে পরাভূত করেছে' *(বুখারী হা/৭৪০৪)*।

١٤- عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

(১৪) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অংগ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয় *(বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩)*।

١٥- عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

(১৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে? *(বুখারী হা/৫৯৯৮; মিশকাত হা/৪৯৪৮)*।

١٦- عَنِ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

(১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ পাঠিয়েছেন। ঐ একভাগ পাওয়ার কারণেই সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা উঠিয়ে নেয় এই আশঙ্কায় যে, সে ব্যাথা পাবে *(বুখারী হা/৬০০০; মুসলিম হা/৭১৪৮)*।

(١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

(১৭) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে এবং পাওনা ফিরিয়ে চায় *(বুখারী হা/২০৭৬; মিশকাত হা/২৭৯০)*।

(١٨) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

(১৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর দয়াপরবশ হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১, সনদ ছহীহ)*।

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

(১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ঠিক ঠিকভাবে নিয়মিত কাজ করে যাও। আর সুসংবাদ দাও। কিন্তু (মনে রেখ) কারো আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতে আবৃত করে রেখেছেন *(বুখারী হা/৬৪৬৭)*।

(٢٠) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

(২০) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে মানুষের উপর দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না *(বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

**মনীষীদের বক্তব্য থেকে :**

১. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, 'আগুনকে রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন, যেন তারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে'।

২. আল্লামা ফীরূযাবাদী (রহঃ) বলেন, 'রহমত আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মাঝে বন্ধন স্বরূপ, যা দ্বারা আল্লাহ বান্দাদের মাঝে স্বীয় রাসূলগণ ও আসমানী কিতাব সমূহ প্রেরণ করেছেন। যা দ্বারা তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, স্বীয় নেকীর হক্বদার করেন, জীবিকা দান করেন এবং ক্ষমা করেন'।

৩. মুহাল্লাব (রহঃ) বলেন, 'রহমতকে আল্লাহ স্বীয় বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়াতে তাদের অন্তরে তা ঢেলে দিয়েছেন, যা দ্বারা আল্লাহ ক্বিয়ামতের ক্ষমা প্রত্যাশীদের ক্ষমা করবেন'।

**সারবস্তু**

১. আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত, যা সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

২. যথাযথ দয়াশীলরা ছাড়া কেউ আল্লাহ্র রহমতের উপযুক্ত হয় না।

৩. কোন সত্য বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছা রহমতের লক্ষণ, আর মতানৈক্যে পৌঁছা দুর্ভাগ্যের।

৪. আল্লাহ্র অশেষ রহমত, তিনি স্বীয় বান্দাদের পাপকাজ ছেড়ে দেয়া ও মর্যাদা লাভের তাওফীক দিয়েছেন।

৫. সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে অনুগ্রহের প্রসার ঘটানো, যা সমাজের অধিবাসীদের উঁচু করে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে।

# ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৭

*-মুযাফফর বিন মুহসিন*

**(২৫) যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে বলে বিশ্বাস করা :**

ইসলাম সম্পর্কে জানার ঘাটতি কতটুকু, তা উক্ত কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র লক্ষ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে। কেবল বিধর্মীদের দোসর শী'আরাই ৩ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে। তাহলে বিধর্মীদের রচনা করা ঐ হাদীছগুলোও কি রাসূলের হাদীছ? সেগুলোও কি আমলযোগ্য? এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যুগের পর যুগ জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে আসছেন এবং অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই হাদীছ জাল-যঈফ হয় না, এমন আক্বীদা পোষণ করা মারাত্মক অন্যায়। বরং সর্বদা জাল-যঈফ হাদীছের আমল বর্জন করে কেবল ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করতে হবে।

যে হাদীছ যঈফ, জাল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে হাদীছ দ্বারা শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ শরী'আত সর্বপ্রকার ত্রুটির উর্ধ্বে। এখানে দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধান অভ্রান্ত ও চিরন্তন।[১] নির্ভরযোগ্য নয় এমন ফাসিক ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিষেধ করেছেন *(হুজুরাত ৬)*। এজন্যই মুহাদ্দিছগণ এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীছকে যঈফ বলেছেন এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাসূল (ছাঃ) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন একাধিক হাদীছে। চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবী এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি আয়াত (কথা) হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। আর বাণী ইসরাঈলদের সম্পর্কেও বর্ণনা কর, তাতে সমস্যা নেই। তবে কেউ যদি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[৩]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

সামুরা ইবনু জুনদুব ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে ধারণা করে যে উহা মিথ্যা, তাহলে সে হবে মিথ্যুকদের একজন'।[৪]

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাফছ ইবনু আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে (যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা করে'।[৫]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কেননা যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৬]

عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنِّيْ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَّنْفَعَنِيْ وإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ.

আসমা ইবনু হাকাম আল-ফাযারী (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি এমন একজন ব্যক্তি, যখন রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ শুনি, তখন আল্লাহ আমাকে তার থেকে উপকার দেন, তিনি যতটুকু উপকার দিতে চান। আর তাঁর ছাহাবীদের মধ্য থেকে কোন ছাহাবী যখন আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন আমি তাকে শপথ করতে বলি। যখন তিনি আমার নিকট শপথ করেন, তখন আমি সেই হাদীছকে বিশ্বাস করি'।[৭]

**জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে হক্বপন্থী মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য :**

শীর্ষস্থানীয় আপোসহীন মুহাদ্দিছগণ ছাহাবায়ে কেরামের পথ অবলম্বন করেছেন। অথচ অনেকে দাবী করে থাকেন জাল ও

১. সূরা হিজর ৯; নাহল ৪৪; আন'আম ১১৫।
২. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১, ১/৪৯১ পৃঃ, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৯৮, পৃঃ ৩২, 'ইলম' অধ্যায়।
৩. ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ১/২১ পৃঃ, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।
৪. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, ১/৬ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৯৯, পৃঃ ৩২, 'ইলম' অধ্যায়।
৫. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/৮ পৃঃ, 'হাদীছ যা শুনবে তাই বর্ণনা করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত হা/১৫৬, পৃঃ ২৮।
৬. ছহীহ বুখারী হা/১০৬, ১/২১ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/৭ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-২।
৭. ছহীহ তিরমিযী হা/৩০০৬, ২/১২৯-৩০ পৃঃ, সনদ হাসান, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা আলে ইমরান' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫২১, ১/২১৩ পৃঃ ও হা/৪০৬, ১/৯২ পৃঃ।

যঈফ হাদীছ আমল করা যাবে। উক্ত দাবী সঠিক নয়। হাদীছ জাল প্রমাণিত হলে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে তা প্রত্যাখ্যাত। উহা প্রচার করা ও আমল করা মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে হারাম। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন,

وهُوَ إِجْمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَرُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْعَمَلِ بِالْمَوْضُوْعِ.

'ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে একটি বিষয় হল জাল হাদীছের প্রতি আমল করা হারাম'।[৮] আহকাম, আক্বীদা, ফযীলত, ওয়ায-নছীহত কিংবা উৎসাহ ও সতর্কতা যে কারণেই জাল হাদীছ বর্ণনা করা হোক, মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা দ্বারা তা হারাম, কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ। ইমাম নববী (রহঃ) তাই বলেন,

أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيْ تَحْرِيْمِ الْكِذْبِ عَلَيْهِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمَا لَاحُكْمَ فِيْهِ كَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالْمَوَاعِظِ وَغَيْرِذَلِكَ فَكُلُّهُ حَرَامٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

'শরী'আতের আহকাম ছাড়াও উৎসাহ, ভীতি, উপদেশসহ যে বিষয়েই রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা হোক, তা হারাম। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম, বৃহৎ কাবীরা গোনাহ সমূহ ও জঘন্য কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত'। মুহাদ্দিছ যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ.

'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে, সে শয়তানের খাদেম'।[৯]

যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি কেউ কেউ শিথিলতা প্রদর্শন করলেও প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযাম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করেছেন।

সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِيْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

'স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের নীতিও তাই প্রমাণ করে। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষারোপ করেছেন, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও একটি প্রমাণ'।[১০]

ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেছেন, بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا 'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা'।[১১] অতঃপর তিনি এর পক্ষে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট যঈফ হাদীছ বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ, আমল করা তো অনেক দূরের কথা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আবু হাতেম ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) পরিষ্কারভাবে বলেন,

ما رُوِيَ الضَّعِيْفُ وَمَا لَمْ يَرْوِ فِيْ الْحُكْمِ سَيَّانِ أَنَّهُ لَايُعْمَلُ بِخَبَرِ الضَّعِيْفِ وَأَنَّ وُجُوْدَهُ كَعَدَمِهِ.

'যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা হোক বা না হোক, হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান। অর্থাৎ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায় না। নিশ্চয় এর অস্তিত্ব থাকা- না থাকার মতই'।[১২]

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) বলেন, إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لَايُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا 'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[১৩]

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা, শায়খ আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لَايَجُوْزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِيْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلَا حَسَنَةً.

'শরী'আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি'।[১৪]

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃঃ/১৩৩৩-১৪২০ হিঃ) সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠচিত্তে বলেন,

وَهَذَا وَالَّذِيْ أُدَيِّنُ اللهَ بِهِ وَأَدْعُوْ النَّاسَ إِلَيْهِ أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لَا يُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا لَافِيْ الْفَضَائِلِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَلَا فِيْ غَيْرِهِمَا.

'এ জন্যই আমি আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাই এবং মানুষকেও আমি এদিকেই আহ্বান করি যে, যঈফ হাদীছের উপর কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না। না ফযীলতের ক্ষেত্রে, না মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েও যঈফ হাদীছ গ্রহণ করা যায় না'।[১৫]

তাছাড়া মুহাদ্দিছগণের অন্যতম মূলনীতি হল, যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করা

---

৮. ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ, আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাশ্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১/৩৩২ পৃঃ।
৯. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩ পৃঃ।
১০. আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফনূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।
১১. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১/৯ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৪।
১২. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৪।
১৩. হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৭-৪৮ পৃঃ।
১৪. ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।
১৫. ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫০; যঈফুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৪৫ পৃঃ।

যাবে না।[১৬] উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন্ পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বলা যায় না। এমনকি কোন ছাহাবী, তাবেঈর নামেও বর্ণনা করা যায় না। তাহলে কোন্ বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট। মোটকথা যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম ঐক্যের মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

*(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' শীর্ষক বই)।*

**(২৬) যে সমস্ত ভাল কাজ শরী'আতে পাওয়া যায় না, সেগুলোকে বিদ'আতে হাসানাহ মনে করা। অর্থাৎ ভাল কাজ মনে করে বিদ'আত করা।**

**পর্যালোচনা :**

কোন্টি ভাল কাজ আর কোন্টি খারাপ কাজ তা বাছাই করার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের? কারণ ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের নেই। মুসলিম ব্যক্তি হিসাবে বিদ'আত ও কুসংস্কার সম্পর্কে না জানা দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। শরী'আতের কাছে যা ভাল নয়, তা মানুষের কাছে যতই ভাল হোক, তা কখনোই ভাল নয়। বরং এ ধরনের কাজ করা গর্হিত অন্যায়। অধিকাংশ আলেম এর সঠিক সংজ্ঞা বুঝেন না। বিদ'আত শব্দটির শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ দু'টিই কুরআন-সুন্নাহ্র মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৭] রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় যতবার খুৎবা দিয়েছেন, ততবারই বিদ'আত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন। বর্তমান আলেম ও খত্বীবরাও প্রতিনিয়ত ঐ খুৎবা পড়েন, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেন না। মূলতঃ বিদ'আত হল, নেকীর আশায় শরী'আত মনে করে এমন আমল করা, শরী'আতে যার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।[১৮] অর্থাৎ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্ভট, ভুয়া, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও তৈরি করা আমলকে বিদ'আত বলে। রাসূল (ছা:) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'কেউ যদি এমন আমল করে, যে আমলের পক্ষে আমাদের নির্দেশ নেই, সেই আমল প্রত্যাখ্যাত'।[১৯]

**বিদ'আতের পরিণাম :**

বিদ'আতের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তব্য এসেছে।

**(ক) বিদ'আত শরী'আতকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করে :**

শরী'আতকে আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখানে সংযোজন বা বিয়োজনের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا 'আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, আমার নে'মত তোমাদের জন্য সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

স্বয়ং আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই এর মধ্যে কোন নতুন আমল ও ইবাদত বৃদ্ধি করা যাবে না। যদি কোন স্বার্থান্বেষী মহল ইসলামের সাথে মিথ্যা আমলের জন্ম দেয়, তবে তা হবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ, যা হারাম *(আ'রাফ ৩৩)*। যেমন মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, ঈদে মীলাদুন নবী, কুলখানী, চল্লিশা, ইছালে দাওয়াত, উরস, আখেরী মুনাজাত, ফরয ছালাতের পর সম্মিলিত দু'আ, জানাযার পর ও মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর প্রচলিত মুনাজাতসহ অসংখ্য বিদ'আত সৃষ্টি করে শরী'আতের উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে। কারণ শরী'আতে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

**(খ) বিদ'আত শরী'আতকে হত্যা করে :**

যে স্থানে বিদ'আত চালু হয় সেখান থেকে সুন্নাত বিদায় নেয়।

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

হাস্সান (রাঃ) বলেন, 'কোন সম্প্রদায় যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত আবিষ্কার করে, তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাত থেকে সমপরিমাণ সুন্নাত ছিনিয়ে নেন। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে তিনি আর সেই সুন্নাতকে ফেরত দেন না'।[২০]

বিদ'আত কত বড় অন্যায় তা উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। বিদ'আতী শুধু পাপকারী নয় বরং সুন্নাতকেও হত্যাকারী।

**(গ) বিদ'আতীর কোন আমল আল্লাহ কবুল করবেন না :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا-الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا- أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا- ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا آيَاتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا.

'আপনি বলুন, আমল করার কারণে যারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আমি কি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিব? ঐ সমস্ত লোক তারাই, দুনিয়াতেই যাদের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে গেছে, যদিও তারা মনে করছে, তারা ভাল আমলই করছে। তারাই ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রতিপালকের বিধান ও তাঁর স্বাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। এই কারণে তাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমি ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য প্রমাণ স্থাপন করব না। জাহান্নামই হবে তাদের প্রতিদান, যেমন তারা অস্বীকার করেছে এবং আমার বিধান ও রাসূলগণকে ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছে' *(কাহফ ১০৩-১০৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا.

'তাদের আমলগুলো দেখার জন্য অগ্রগামী হব। অতঃপর যেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই-সেই আমল প্রত্যাখ্যাত।[২১]

---

১৬. দেখুন : ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।

১৭. সূরা আহক্বাফ ৯; বাক্বারাহ ১১৭; বুখারী হা/২০১২।

১৮. ইমাম শাত্বেবী, কিতাবুল ই'তিছাম ১/১৩৭ পৃঃ।

১৯. ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৯০, ২/৭৭ পৃঃ।

২০. দারেমী হা/৯৯; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৮৮।

২১. ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৯০, 'বিচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; বুখারী হা/৭৩৫০-এর আলোচনা দ্রঃ, 'ই'তিছাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাতে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষণ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকে কোন নফল ও কোন ফরয ইবাদত কবুল করবেন না।[২২]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে মদীনার কথা বর্ণিত হলেও হুকুমটা ব্যাপক। যেমন আবুদাঊদের হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়।[২৩]

**(ঙ) বিদ'আতী রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পাবে না এবং কাওছারের পানিও পান করতে পারবে না :**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ.

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগেই হাওযে কাওছারের নিকটে পৌঁছে যাব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সেই পানি পান করবে। আর যে পানি পান করবে, তার আর কখনো পিপাসা লাগবে না। ইতিমধ্যে অনেকগুলো দল আমার নিকটে আসবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর তাদের মাঝে আর আমার মাঝে আড় সৃষ্টি করা হবে। আমি বলব, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পর তারা কত বিদ'আত করেছে। অতঃপর আমি বলব, তারা অভিশপ্ত, তারা অভিশপ্ত, যারা আমার মৃত্যুর পর দ্বীনের পরিবর্তন করেছে।[২৪]

বিত'আতীদের জন্য ক্বিয়ামতের মাঠ যে কত জটিল ও কঠিন হবে, তা উক্ত হাদীছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে ইসলামের নামে যত বাতিল দলের জন্ম হয়েছে, সেগুলোর সাথে যারা জড়িত হবে তারাই বেশী অপমানিত হবে। কারণ উক্ত ভ্রান্ত দলগুলোই শিরক, বিদ'আত ও জাল হাদীছের প্রচারক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভ্রান্ত ফের্কা থেকে দূরে থাকতে হবে।

**(চ) বিদ'আতীরা হাশরের মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর দলভুক্ত হতে পারবে না :**

পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যে নেতার আদর্শের অনুসরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি ঐ নেতার সাথে অবস্থান করবে। বিদ'আতীরা যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ না করে বিভিন্ন ইমাম, পীর-মাশায়েখ ও কথিত দার্শনিকের মিথ্যা আদর্শের অনুসরণ করে থাকে, সেহেতু তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দলভুক্ত হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাই প্রত্যেক মানুষকে তার নেতাসহ আহ্বান করবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

'সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব; অনন্তর যাদেরকে ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না' *(বানী ইসরাঈল ৭১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বিগত একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।[২৫]

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হল, তার পালনীয় আদর্শগুলো যাচাই করা। তিনি কার আদর্শের অনুকরণ করছেন। প্রতিনিয়ত ভাববেন, ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) তার নেতা হবেন কি-না। এ জন্য ছহীহ হাদীছের অনুকরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

**(ছ) বিদ'আতী জাহান্নামী :**

বিদ'আতী ব্যক্তি আমলের জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, কোনই লাভ হবে না। অবশেষে সে অপমানিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খুৎবায় আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন এবং গুণগান করতেন যেমন তিনি তার অধিকারী। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য হাদীছ হল আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ; কাজের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল নতুন আমল। আর প্রত্যেক নতুন আমলই বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।[২৬]

সুধী পাঠক! ভালর নামে যারা বিদ'আতী আমলের তাবেদারী করছে এবং যারা বিদ'আতের পক্ষে দালালী করছে তাদের জন্য কোন ছাড় নেই। অতি সত্বর বিদ'আত ছেড়ে তওবা করতে হবে। *(চলবে)*

---

২২. মুসলিম হা/৩৩৮৯ ও ৩৩৯৬, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; বুখারী হা/১৮৭০, 'মদীনার ফযীলত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।
২৩. আবুদাঊদ হা/৪৫৩০, 'দিয়াত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১।
২৪. বুখারী হা/৭০৫০-৭০৫১, 'ফেৎনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৬১০৮, 'ফযীলত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।
২৫. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত : ১৪০৮/১৯৮৮), সূরা বানী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃঃ।
২৬. নাসাঈ হা/১৫৭৮, সনদ ছহীহ।

# পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার

-বযলুর রহমান

(শেষ কিস্তি)

## পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার

মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে থাকে। উক্ত খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলী ও কিডনীর মাধ্যমে রিপিয়ারিং বা পরিশোধিত হয়ে শরীরের পুষ্টিগত ঘাটতি ও রক্তের স্বচ্ছতা মিটিয়ে অপ্রয়োজনীয় খাদ্য পায়খানা আকারে এবং পানীয় পেশাব আকারে বের হয়ে যায়। ফলে শারীরিক সুস্থতা ও দৈহিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে পেশাব ও পায়খানা অপবিত্র হিসাবে পরিগণিত হয় এবং মানুষও অপবিত্র হয়ে যায়। তখন পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন, أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ 'যখন তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে তখন সে যেন পবিত্রতা অর্জন করে নেয়...' *(মায়েদা ৫/৬)*। পায়খানা ও পেশাবের ছিটেফোঁটা থেকে বেঁচে থাকা ও পবিত্রতা অর্জন করা মুমিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব হয়ে থাকে পেশাব ও পায়খানা থেকে অসতর্ক থাকার কারণে।[২৭] পেশাবের ছিটেফোঁটা থেকে বেঁচে থাকার কঠোরতা সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, নিশ্চয় এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এই শাস্তি কোন বড় ধরণের গুনাহের কারণে নয়। তাদের মধ্যে একজন পেশাব–পায়খানা থেকে অসতর্ক থাকত এবং অন্য জন চোগলখোরী করত। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের একটি কাঁচা ডাল আনতে বললেন। তারপর তা দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টি কবরে পুতে দিলেন এবং বললেন, সম্ভবত: যতক্ষণ না এই ডাল শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে'।[২৮] মূসা (আঃ)-এর কুওম বনী ইসরাঈলরা তাদের শরীরে বা কাপড়ের কোন স্থানে যদি পেশাবের ছিটেফোঁটা লেগে যেত তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য উক্ত জায়গা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত। যে ব্যক্তি এটা ছেড়ে দিতে বাধা দিয়েছিল তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।[২৯] এমনকি মহানবী (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।[৩০] উল্লেখ্য কবরের উপর কাঁচা খেজুরের ডাল পুঁতে দেওয়া শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত। এটা অন্যদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। নিম্নে পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

### ১. টয়লেটে ঢোকার পূর্বে নির্দিষ্ট দো'আ পাঠ করা ও বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আধুনিক টয়লেটের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখন পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হত তখন তিনি লোকালয় থেকে একটু দূরে চলে যেতেন। যাতে কেউ দেখতে না পায়। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৩১] আর যখন তিনি টয়লেটে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন প্রবেশের পূর্বে নির্ধারিত দো'য়া পাঠ করতেন।

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ.

আব্দুল আযীয ইবনু ছুহাইব (রহঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন নবী করীম (ছাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে টয়লেটে যেতেন তখন বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' অতঃপর সাঈদ ইবনু যায়েদ আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) যখন টয়লেটে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন (তখন উক্ত দো'য়া পাঠ করতেন) অর্থাৎ টয়লেটে ঢোকার পূর্বেই' ।[৩২]

উল্লেখ্য যে, ইবনু মাজাহ-এর[৩৩] ছহীহ রেওয়াতে উক্ত দো'আর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। সুতরাং বিসমিল্লাহ যোগ করে দো'য়া পাঠ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করতেন।[৩৪] ইমাম নববী (রহঃ)ও টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা ব্যবহারের

---

২৭. 'আওনুল মা'বুদ ১/২৭ পৃঃ, হা/২১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ইবনু মাজাহ ১/২৯ পৃঃ, হা/৩৪৮; বুলূগুল মারাম হা/১০১, পৃঃ ৩৮।

২৮. আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/২০; ছহীহ বুখারী ১/৩৪-৩৫ পৃঃ, হা/২১৮; ছহীহ মুসলিম ১/১৪১ পৃঃ, হা/৭০৩; নাসাঈ ১/৬ পৃঃ, হা/৩০; ইবনু মাজাহ ১/২৯ পৃঃ, হা/৩৪৭ ও ৩৪৯; মিশকাত হা/৩৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১১, ২/৬০ পৃঃ।

২৯. আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/২২; নাসাঈ ১/৬ পৃঃ, হা/৩০; ইবনু মাজাহ ১/২৯ পৃঃ, হা/৩৪৬; মিশকাত হা/৩৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৩, ২/৭০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

৩০. আবুদাঊদ ১/৩ পৃঃ, হা/৭, ৮; নাসাঈ ১/৭ পৃঃ, হা/৪০ 'গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১৩ 'পাথর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা' এবং 'গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২০, ২/৬৩ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

৩১. আবুদাঊদ ১/২ পৃঃ, হা/১ ও ২; তিরমিযী ১/৩১-৩২ পৃঃ, হা/২০; নাসাঈ ১/৪ পৃঃ, হা/১৬,১৭; ইবনু মাজাহ ১/২৮ পৃঃ, হা/৩৩১-৩৩৬; মিশকাত হা/৩৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৭, ২/৬২ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

৩২. ছহীহ বুখারী ১/২৬ পৃঃ, হা/১৪২ ও ৬৩২২, 'টয়লেটে যাওয়ার সময় কী দো'য়া বলতে হয়' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৩ পৃঃ, হা/৮৫৭; 'আওনুল মা'বুদ ১/১২-১৩ পৃঃ, 'টয়লেটে যাওয়ার সময় কী বলতে হয়' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; তিরমিযী ১/১১-১২ পৃঃ, হা/৬; নাসাঈ ১/৫ পৃঃ, হা/১৯; ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/২৯৬; মিশকাত হা/৩৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১০, ২/৬০ পৃঃ।

৩৩. ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/২৯৭ ।

কথা বলেছেন।[৩৫] সুতরাং টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দো'আ পাঠ করতে হবে এবং বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

**২. খোলাস্থানে ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে না বসা :**

পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিঠ ফিরে বসা ঠিক নয়। কেননা এটা ক্বিবলাকে অসম্মানের কারণ।[৩৬] তাছাড়া এটা করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

আবু আইয়ূব আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ টয়লেটে যায় তখন সে যেন ক্বিবলাকে সম্মুখ ও পশ্চাতে না রাখে। বরং সে যেন পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরে বসে।[৩৭] উল্লেখ্য যে, شرقوا او غربوا দ্বারা মাদীনা বাসীদের কথা বলা হয়েছে। কারণ মাদীনা থেকে বায়তুল্লাহ তথা ক্বিবলা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।[৩৮] সুতরাং এখানে ক্বিবলাকে সম্মান করা শর্ত। তাই যাদের যে দিকে ক্বিবলা সে দিকে মুখ ও পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এ মর্মে আরো পরিষ্কার সমাধান নিম্মের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا.

রাফি' ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) বলেন, আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-এর মিসরে থাকাকালীন তাকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি না কিভাবে এই টয়লেটগুলো ব্যবহার করব। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মল-মূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে গমন করবে তখন সে যেন ক্বিবলামুখী হয়ে ও ক্বিবলাকে পিছনে রেখে না বসে।[৩৯] উল্লেখ্য যে, পর্দার সাথে বাড়ী, পরিবেষ্টিত টয়লেট অথবা খোলা স্থানে ক্বিবলার দিকে আড় থাকলে মুখ অথবা পিঠ ফিরে বসা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কাঁচা ইটের[৪০] উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন।[৪১] বলা বাহুল্য যে, বায়তুল মুকাদ্দাস সেই সময়ে মুসলমানদের ক্বিবলা ছিল। এটার কারণ হল শুধুমাত্র ক্বিবলাকে সম্মান করা। এ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪২]

**৩. মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা ঢেকে টয়লেটে প্রবেশ না করা :**

পেশাব-পায়খানায় যাবার সময় মাথা ঢেকে প্রবেশ করার প্রচলিত প্রথা ঠিক নয়। কেননা একদিকে শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই অপরদিকে এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৪৩] হাদীছটি নিম্মরুপ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ...

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর মাথা ঢেকে নিতেন...।[৪৪]

**৪. টয়লেটে কোন যিকির বা দো'আ পাঠ না করা :**

টয়লেট অপবিত্র স্থান। তাই টয়লেটে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় সালামের জবাব, কোন যিকির বা অন্য কোন দো'য়া পাঠ করা উচিত নয়। আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك فالوقت في تلك الحالة 'টয়লেটে থাকাবস্থায় আল্লাহ্র স্বরণ থেকে দূরে থাকা হয় বলে (টয়লেট থেকে বের হয়ে غفرانك) দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।[৪৫] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন।[৪৬] অথচ টয়লেটে গিয়ে তিনি বিরত থাকতেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাঁকে সালাম দেয়। তখন তিনি পেশাব করছিলেন। ফলে তিনি তাঁর সালামের জবাব দেননি।[৪৭] অবশ্য টয়লেট থেকে বের হয়ে তিনি সালামের

---

৩৪. ছহীহ বুখারী ১/২৮-২৯ পৃঃ, হা/১৬৮; ছহীহ মুসলিম হা/৬১৬,৬১৭; আবুদাঊদ ১/৫ পৃঃ, হা/৩২-৩৩) ।

৩৫. وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل ومما هو في معناه يستحب والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك -كله لكرامة اليمين وشرفها. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৫ পৃঃ, হা/৩২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩৬. 'আওনুল মা'বুদ ১/১৪ পৃঃ, হা/৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩৭. ছহীহ বুখারী ১/২৬ ও ৫৭ পৃঃ, হা/১৪৪ ও ৩৯৪; ছহীহ মুসলিম হা/৬৩২; আবুদাঊদ ১/৩ পৃঃ, হা/৯; নাসাঈ ১/৫ পৃঃ, হা/২১; ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১৮; তিরমিযী ১/১৩-১৪ পৃঃ, হা/৮; বুলূগুল মারাম হা/৯৬, পৃঃ ৩৭; মিশকাত হা/৩৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮, ২/৫৮-৫৯ পৃঃ।

৩৮. 'আওনুল মা'বুদ ১/১৬ পৃঃ, হা/৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী শারহ জা-মে'উত তিরমিযী (কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হাদীছ, ১৪২১ হিঃ/২০০১ খৃঃ) ১/৪৪ পৃঃ, হা/৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯. নাসাঈ ১/৫ পৃঃ, হা/২০।

৪০. 'আওনুল মা'বুদ ১/১৭ পৃঃ।

৪১. আবুদাঊদ হা/১২; নাসাঈ হা/২৩, সনদ ছহীহ।

৪২. তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ১/৪৪-৫০ পৃঃ, হা/৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৯২।

৪৪. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬৪।

৪৫. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৩ পৃঃ; হা/৩০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৬. ছহীহ মুসমিল হা/৮৫২; كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/১৮; ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/৩০২। আবুদাঊদ ১/৩-৪ পৃঃ, হা/১৭।

৪৭. আবুদাঊদ ১/৩-৪ পৃঃ হা/১৬; ইবনু মাজাহ ১/২৯ পৃঃ, হা/৩৫৩; নাসাঈ ১/৭ পৃঃ, হা/৩৭।

জবাব দিয়েছিলেন।[৪৮] অতএব উক্ত স্থানে সালামের জবাব প্রদানসহ অন্যান্য সাধারণ দো'আ পাঠ না করাই উত্তম।

**৫. পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ও প্রচলিত কুলুপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা :**

প্রাকৃতিক প্রয়োজনের পর পানির উপস্থিতিতে পানি দিয়েই ইস্তিঞ্জা করতে হবে। কেননা মানব জাতির অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শবান ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি দিয়েই ইস্তিঞ্জা করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মধ্যকার এক গোলাম অর্থাৎ ছোট ছেলেকে[৪৯] নিয়ে একটি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শিশুটি তাঁর হাতে বহনকৃত ওযূর পানির পাত্রটি একটি বরই গাছের নিচে রাখল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব-পায়খানা শেষে পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।[৫০] তাছাড়া কুফাবাসীদের মর্যাদার শানে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াতের[৫১] মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার গুরুত্ব অত্যাধিক। তাই পেশাব-পায়খানার পর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাই সুন্নাত।

তবে পানির অবর্তমানে কুলুপ ব্যবহার করা যায়। এজন্য পবিত্র[৫২] ঢেলা, মাটিযুক্ত পাথর, টিস্যু পেপার ইত্যাদি বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে তখন সে যেন তাঁর সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যায়, যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটিই তাঁর জন্য যথেষ্ট।[৫৩] গোবর, হাড় ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যাবে না।[৫৪] পবিত্রতা অর্জনে সন্দেহ থাকার অজুহাতে কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাটাহাটি, বিভিন্ন শারিরীক কসরত, কাঁশি ইত্যাদি দেওয়া যাবে না। কেননা তা একদিকে যেমন বেহায়াপনা ও লজ্জাশীলতার পরিচয় এবং শিষ্টাচারের পরিপন্থী, তেমন অন্যদিকে শরী'আতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। যা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট দলীলের উপর নির্ভরশীল। অতএব এই বদ অভ্যাস অবশ্যই পরিতাজ্য। তবে পেশাব-পায়খানা থেকে আসার পর সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার জন্য ওযূর পর লজ্জাস্থান বরাবর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।[৫৫]

**৬. পেশাব-পায়খানা আটকে রেখে ছালাত আদায় না করা :**

পেশাব-পায়খানা আটকে রেখে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কেননা তা ছালাতের খুশু-খুযু ও আন্তরিকতায় গোলযোগ সৃষ্টি করে।[৫৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি হজ্জ অথবা উমরার জন্য বের হন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে আরো কয়েকজন লোক ছিল। তিনি তাদের ছালাতের ইমামতি করতেন। একদিন ফযরের ছালাতের ইক্বামত দেওয়ার পর বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ সামনে আগমন কর (ছালাতে ইমামতির জন্য)। অতঃপর তিনি টয়লেটে গমনকালে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ছালাতের ইক্বামাত দেওয়ার পর তোমাদের মধ্যে কারো যদি পেশাব-পায়খানার বেগ হয় তাহলে সে যেন তা ছালাতের পূর্বেই সেরে নেয়।[৫৭] সুতরাং পেশাব-পায়খানা আটকে রেখে বিরক্তবোধের সাথে ছালাত আদায় করার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলে ছালাত খুশু-খুযু ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করা যাবে।

**৭. ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ ও ইস্তিঞ্জা না কর :**

পেশাব-পায়খানা করার সময় ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ ও ইস্তিঞ্জা করা যাবে না। কেননা এটি ডান হাতের মর্যাদার পরিপন্থী।[৫৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আবু ক্বাতাদা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানীয় পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন টয়লেটে যায় তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তাঁর গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ইস্তিঞ্জা না করে'।[৫৯] উল্লেখ্য যে, বাম হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।[৬০]

---

৪৮. আবুদাঊদ ১/৩-৪ পৃঃ, হা/১৭।

৪৯. 'আওনুল মা'বুদ ১/৪৩ পৃঃ, হা/৪৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫০. আবুদাঊদ ১/৭ পৃঃ, হা/৪৩; ছহীহ বুখারী ১/২৭ পৃঃ, হা/১৫০; ছহীহ মুসলিম হা/৬৪২-৬৪৪; তিরমিযী ১/৩০-৩১ পৃঃ, হা/১৯; নাসাঈ ১/৮ পৃঃ, হা/৪৫; ইবনু মাজাহ ১/২৯-৩০, হা/৩৫৪-৫৫; মিশকাত হা/৩৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৫, ২/৬১ পৃঃ।

৫১. আবুদাউদ ১/৭ পৃঃ, হা/৪৪; ইবনু মাজাহ ১/২৯-৩০ পৃঃ, হা/৩৫৫।

৫২. ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১৫; আবুদাউদ ১/৬ পৃঃ, হা/৪১।

৫৩. আবুদাউদ ১/৬ পৃঃ, হা/৪০; নাসাঈ ১/৮ পৃঃ, হা/৪৪; ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১৪-৩১৫; মিশকাত হা/৩৪১, ৩৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৪ ও ৩২২, ২/৬১ ও ৬৩ পৃঃ।

৫৪. ছহীহ বুখারী ১/২৭ পৃঃ, হা/১৫৫-১৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/৬০৬-৬০৮; আবুদাউদ ১/৬ পৃঃ, হা/৩৬ ও ৩৮-৩৯; তিরমিযী ১/২৪-২৫ পৃঃ, হা/১৬,১৭; ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১৩; নাসাঈ ১/৭ পৃঃ, হা/৪০; বুলূগুল মারাম হা/৯৫; মিশকাত হা/৩৩৬,৩৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৯,৩২৩; ২/৫৯, ৬৩-৬৪ পৃঃ।

৫৫. আবুদাউদ ১/২২ পৃঃ, হা/১৬৬-১৬৮; নাসাঈ ১/১৭ পৃঃ, হা/১৩৪; ইবনু মাজাহ ১/৩৬ পৃঃ, হা/৪৬১-৪৬২ ও ৪৬৪।

৫৬. لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه -'আওনুল মা'বুদ ১/১১১ পৃঃ, হা/৮৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৭. আবুদাউদ ১/১২ পৃঃ, হা/৮৮; ইবনু মাজাহ ১/৪৮ পৃঃ, হা/৬৪৮-৬৫১।

৫৮. حال البول تكريما لليمين فيكره بها بلا حاجة –'আওনুল মা'বুদ ১/৩৪ পৃঃ, হা/৩১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯. ছহীহ বুখারী ১/২৭ পৃঃ, হা/১৫৩-১৫৪, ৫৬৩০; ছহীহ মুসলিম হা/৬১৩-৬১৫; আবুদাউদ ১/৫ পৃঃ, হা/ ৩১; তিরমিযী ১/২৩ পৃঃ, হা/১৫; মিশকাত হা/৩৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৩, ২/৬১ পৃঃ।

৬০. ইবনু মাজাহ ১/২৭ পৃঃ, হা/৩১২; 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৫ পৃঃ, হা/৩২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

**৮. সামনে পর্দা রেখে নির্জনে ও একাকী বসে পেশাব-পায়খানা করা :**

পেশাব-পায়খানা করার সময় সামনে পর্দা রাখা সুন্নাত। কেননা এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল। এ সম্পর্কে 'কুতুবে সিত্তাহ'-এর প্রসিদ্ধ তিনজন মুহাদ্দিছ তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থ সমূহে যেমন-ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) 'পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা', ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) 'সুতরার মাধ্যমে আড়াল করে পেশাব করা', ও ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৫হিঃ) 'পেশাব-পায়খানা করার সময় পর্দা করা' নামে ত্বাহারাৎ অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। উক্ত মহামতি তিনজন মুহাদ্দিছগণের উক্ত শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব-পায়খানা করার সময় পর্দা করা উত্তম। তাছাড়া এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবুদাঊদ ও ইবনু মাজাহ্র উক্ত অনুচ্ছেদ সহ ইবনু মাজাহ্র চিকিৎসা অধ্যায়ে 'বিজোড় সংখ্যক সুরমা ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[৬১] ছহীহ হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ. فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.

আব্দুর রহমান ইবনু হাসানাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং 'আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট রওয়ানা দিয়েছিলাম। তখন তিনি একটি ঢালসহ বের হলেন এবং তা দ্বারা আড়াল/পর্দা করে পেশাব করেন। আমরা তখন পরস্পর বললাম, তোমরা তাঁর দিকে দেখ, তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নবী করীম (ছাঃ) তাদের এই কথা শুনতে পেয়ে বললেন, তোমরা কী জান না! বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব লাগলে সে অংশ (কাঁচি দিয়ে) কেটে ফেলত এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ করতে নিষেধ করেছিল তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।[৬২]

পেশাব-পায়খানা করার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দূরে কোথাও নির্জন এলাকায় গমন করতেন। যেন কেউ তাকে দেখতে না পায়। এমনকি সবার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেন।[৬৩] সুতরাং একাকী ও নির্জনে পেশাব-পায়খানা করতে হবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য দূরে চলে যান। এরপর তিনি ফিরে এসে ওযূর পানি চাইলেন এবং ওযূ করলেন।[৬৪] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবুদাঊদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, 'উক্ত হাদীছের দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের নিকট থেকে দূরে গিয়ে একাকী পেশাব-পায়খানা করা, পর্দা নয়। আর এটি সুন্নাত'।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা বসে পেশাব-পায়খানা করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِدًا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে বলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তাঁর কথা বিশ্বাস কর না। কেননা তিনি সর্বদা বসে পেশাব-পায়খানা করতেন।[৬৬] উল্লেখ্য যে, বসে পেশাব-পায়খানা করতে অসুবিধা হলে অথবা বসার স্থান না থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা করা যাবে।[৬৭]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, একদা আমি ও নবী করীম (ছাঃ) এক সাথে চলছিলাম। এমন সময় তিনি দেওয়ালের পিছনের মহল্লাহ্র একটি আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। অতঃপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সেভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর নিকট থেকে সরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।[৬৮] সুতরাং বসতে সমস্যা হলে অথবা বসার স্থান না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করা যাবে। তবে সর্বদা বসে পেশাব করাই উত্তম। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, 'শিষ্ঠাচার পরিপন্থী বলে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে, হারাম হিসেবে নয়'।[৬৯] আল্লামা নাছির উদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'বস্তুতঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করাতে কোন সমস্যা নেই। যদি তা থেকে পবিত্রতা অর্জন ও তাঁর ছিটেফোঁটা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য করা হয়ে থাকে।[৭০]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছে فأشار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আবুদাঊদে এবং তিরমিযীতে دعا[৭১] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এখানে আবুদাঊদ ও তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী পেশাব-পায়খানা

---

৬১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭১,৩৪৯৮; যঈফুল জামে'উছ ছগীর হা/৫৪৬৮; শায়খ নাছির উদ্দীন আলবানী, মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ, সংকলন : মুযাফফর বিন মুহসিন (আছ-ছিরাত প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০১২ ইং) হা/৮৪, ১/৫২ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৫, ২/৬৪ পৃঃ।

৬২. আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/২২; নাসাঈ ১/৬ পৃঃ, হা/৩০; ইবনু মাজাহ ১/২৯ পৃঃ, হা/৩৪৬; মিশকাত হা/৩৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৩, ২/৭০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।

৬৩. ইবনু মাজাহ ১/২৮ পৃঃ, হা/৩৩২; আবুদাঊদ ১/২, হা/১; তিরমিযী ১/৩১-৩২ পৃঃ, হা/২০; নাসাঈ ১/৪ পৃঃ, হা/১৬,১৭; বুলূগুল মারাম হা/৮৮, হাদীছ ছহীহ।

৬৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৩২, সনদ ছহীহ।

৬৫. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৬ পৃঃ, হা/১৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬৬. তিরমিযী ১/১৭ পৃঃ, হা/১২; নাসাঈ ১/৬ পৃঃ, হা/ ২৯; ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/৩০৭; মিশকাত হা/৩৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৭, ২/৬৮ পৃঃ। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি আল্লামা নাছির উদ্দীন আলবানী প্রথমে 'যঈফ' বলেছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনের চূড়ান্ত তাহক্বীক্বে তিনি উক্ত হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন। ইরওয়া উল-গালীল হা/৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১; তারা-জুয়া'তুল আলবানী হা/২।

৬৭. لأنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام-'আওনুল মা'বুদ ১/২৯ পৃঃ, হা/২৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৮. ছহীহ বুখারী ১/৩৫-৩৬ পৃঃ, হা/২২৫; ছহীহ মুসলিম হা/৬২৫; আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/২৩; তিরমিযী ১/১৯ পৃঃ, হা/১৩; ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/৩০৫,৩০৬; নাসাঈ ১/৫-৬ পৃঃ, হা/২৬-২৮; মিশকাত হা/৩৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৬, ২/৬৭ পৃঃ।

৬৯. তিরমিযী ১/১৮ পৃঃ।

৭০. তাহক্বীক্বে মিশকাত ১/১১৭ পৃঃ, হা/৩৬৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১. আবুদাঊদ ১/৪ পৃঃ, হা/২৩; তিরমিযী ১/১৯ পৃঃ, হা/১৩।

করার সময়ে পরস্পর কথা বলা সাব্যস্ত হয় না। যা এক শ্রেণীর মানুষ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। এ সম্পর্কে ইমাম হাফেয ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) (৭৭৩-৮৫২হিঃ) বলেন,

ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ.

'আবুদাঊদ ও তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী পেশাবরত অবস্থায় পরস্পর কথা বলা যায়েয সাব্যস্ত হয় না, যা ছহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণিত। নিশ্চয় এটি দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য, কথা বলা নয়'।[৭২] এছাড়া টয়লেটে থাকাবস্থায় পরস্পর কথা বলা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিরও কারণ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, টয়লেটে তোমাদের মধ্যে একইসাথে দুইজন তাদের কাপড় যেন উন্মোচন করে বের না হয় এবং পরস্পর কথা না বলে। কেননা এটা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির একটি কারণ'।[৭৩] সুতরাং টয়লেটে পরস্পর কথা বলা, অট্টহাসী দেওয়া, গান গাওয়া, আড্ডাবাজী করা ইত্যাদি শিাচার পরিপন্থী। যা আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল, হোস্টেল, মেস গুলোতে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

**৯) যে যে স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষ কয়েকটি স্থানে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো চারটি। যথা:

**(১) ও (২) রাস্তা ও ছাঁয়াদার বৃক্ষের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা :**

এমন রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করে এবং এমন ছাঁয়াদার বৃক্ষ, যার নিচে মানুষ আশ্রয় নেয়, কথা-বার্তা বলে, অবতরণ করে এবং বসে থাকে। সেখানে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না। তবে সব ছাঁয়ার নিচে হারাম নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'হা-য়েশ' নামক গাছের নিচে বসে তাঁর প্রয়োজন সমাধা করতেন।[৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অভিশপ্ত কাজ দু'টি কী কী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের রাস্তায় এবং ছাঁয়াদার বৃক্ষের নিচে পেশাব-পায়খানা করে।[৭৫] অতএব উক্ত দু'টি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**(৩) গোসলখানায় পেশাব না করা :**

গোসলখানায় পেশাব করতঃ সেখানে গোসল করা ঠিক নয়। কেননা এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব করতঃ সেখানে গোসল না করে।[৭৬] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের দ্বিতীয়াংশ (أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه) 'অতঃপর সেখানে ওযূ করে। কেননা অধিকাংশ সন্দেহ এখান থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে') যঈফ।[৭৭] তবে আধুনিক যুগের গোসলখানা গুলোতে যায়েয। যদি সেখানে পানি স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আল্লামা ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, গোসলখানা যদি প্রশস্ত ও পানি স্থানান্তরের ব্যবস্থা থাকে এবং পানি ছিটিয়ে না উঠে (তাহলে যায়েয আছে)।[৭৮]

**(৪) আবদ্ধ পানিতে পেশাব না করা :**

প্রবাহিত হয় না এমন পানিকে আবদ্ধ পানি বলা হয়।[৭৯] এরূপ পানিতে পেশাব করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। যেমন পুকুর, চৌবাচ্চা বা ট্যাংক প্রভৃতি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্থির বা প্রবাহিত হয় না এমন পানিতে পেশাব করে উক্ত পানি দিয়ে গোসল না করে।[৮০] সুতরাং আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু এমন আবদ্ধ পানি, যার পরিমাণ অনেক বেশী সেখানে পেশাব করা হারাম নয়। আর এটিই হাদীছের বিবেচ্য বিষয়।[৮১] তবে প্রবাহিত পানিতে পেশাব-পায়খানা করা যাবে।[৮২] সুতরাং উপরোক্ত চারটি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

৭২. তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৫৮ পৃঃ, হা/১৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭৩. আবুদাঊদ ১/৩ পৃঃ, হা/১৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৭১; হাকেম হা/১১৬১৮; মুসনাদে আহমাদ হা/১১৩৬৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৩৫; যঈফুল জামে' হা/১৪৪৭৮; মিশকাত হা/৩৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৯,২/৬৫-৬৬ পৃঃ; উল্লেখ্য, উপরিউক্ত হাদীছটি আল্লামা নাছিরউদ্দীন আলবানী (রহঃ) প্রথমে 'যঈফ' বলেছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনের চূড়ান্ত তাহক্বীক্বে উক্ত হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন, তারা-জু'আতুল আলবানী হা/২৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫,১৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১২০।

৭৪. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩০-৩১ পৃঃ , হা/২৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬৪১; আবুদাঊদ ১/৫ পৃঃ, হা/২৫,২৬; ইবনু মাজাহ ১/২৮ পৃঃ, হা/৩২৮; বুলূগুল মারাম হা/৮৯-৯২; ইরওয়া উল-গালীল হা/৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৪৮; আল-জামি'উছ ছগীর হা/১১০; মিশকাত হা/৩৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৮, ২/৬৫ পৃঃ।

৭৬. আবুদাঊদ ১/৫ পৃঃ, হা/২৭,২৮; তিরমিযী ১/৩২-৩৩ পৃঃ, হা/২১; ইবনু মাজাহ ১/২৬ পৃঃ, হা/৩০৪; নাসাঈ ১/৭ পৃঃ, হা/৩৬; মিশকাত হা/৩৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৬, ২/৬৫ পৃঃ।

৭৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭; যঈফ তিরমিযী হা/২১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩০৪; যঈফ নাসাঈ হা/৩৬; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ, হা/৮৫, ১/৫২ পৃঃ।

৭৮. তিরমিযী ১/৩৩ পৃঃ; 'আওনুল মা'বুদ ১/৩২ পৃঃ, হা/২৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৯. 'আওনুল মা'বুদ ১/৯২ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৩৬ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮০. ছহীহ মুসলিম ১/১৩৮ পৃঃ, হা/৬৮২-৬৮৪; ছহীহ বুখারী ১/৩৭ পৃঃ, হা/২৩৯; আবুদাঊদ ১/১০ পৃঃ, হা/৬৯,৭০; মিশকাত হা/৪৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৪-৪৪৫, ২/১১৩-১১৪ পৃঃ।

৮১. 'আওনুল মা'বুদ ১/৯৩ পৃঃ, হা/৬৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২. আবুদাঊদ হা/৮৩।

**১০. মাটি/সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা এবং বাম পা দিয়ে বের হওয়া ও দো'আ পাঠ করা :**

টয়লেট থেকে বের হয়ে হাত দু'টি ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। কারণ সৌচকার্য সমাধার পর হাতে অনেক জীবানু থাকে। যা মাটি বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার না করলে শরীরের স্বাস্থ্যহানী ঘটে। সর্বোপরি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটি করতেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِى تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম ( ছাঃ) টয়লেটে যেতেন তখন আমি তাঁর নিকট পিতল বা চামড়ার ছোট পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জা করতেন। তারপর মাটিতে হাত ঘোষতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম। তারপর ওযূ করতেন।[৮৩] সুতরাং ইস্তিঞ্জা করার পর হাত মাটি/সাবান দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইস্তিঞ্জার পর অতিরিক্ত পানি দিয়ে ওযূ করা যাবে না বলে একটি ভুল প্রথা সমাজে চালু আছে। অথচ উক্ত হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যা আদৌ ঠিক নয়। কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় পরিষ্কারভাবে মুহাদ্দিছগণ বলেন,

ليس المعنى أنه لا يجوز التوضىء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل.

'ইস্তিঞ্জা করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে না মর্মে এ হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। কেননা উক্ত হাদীছে 'আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম' দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো প্রথম পাত্রে পানি অবশিষ্ট ছিল না অথবা অল্প ছিল'।[৮৪]

পেশাব-পায়খানার পর টয়লেট থেকে ডান পা আগে দিয়ে বের হতে হবে[৮৫] এবং নির্ধারিত দো'য়া পাঠ করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন টয়লেট থেকে বের হতেন তখন তিনি غُفْرَانَكَ ('হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর') বলতেন'।[৮৬] উল্লেখ্য যে, টয়লেট থেকে বের হয়ে এই الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ('সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন'।) দো'য়াটি পড়তেন মর্মে যে হাদীছটি ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত হয়েছে, সেটি চূড়ান্ত তাহক্বীক্ব অনুযায়ী যঈফ।[৮৭]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। অথচ আমাদের দেশে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত অপরিষ্কার, অপরিচ্ছনতা, নোংরা ও স্বাস্থ্যহানীকর পরিবেশের কারণে প্রতি বছর অসংখ্য সন্তান অকাতরে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। বাড়ির আঙ্গিনার আশে-পাশে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ, নিজেদের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রগুলো অপরিষ্কার, রান্নাঘরের বাসন-কোষন, হাড়ি-পাতিল প্রভৃতি নোংরা থাকার কারণে সাধারণত এমনটি হয়ে থাকে। হোস্টেলের ছাত্ররা নিজেদের থাকার রুম, টেবিলের বইপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ অলসতার কারণে পরিষ্কার রাখে না। ফলে তাদের স্মৃতি শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, যা একজন ছাত্রের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ। অথচ সময়মত তারা তাদের টেবিলে বইগুলো ও পোশাক-পরিচ্ছদগুলো তার স্থানে সুন্দর পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখবে। এটি একজন আদর্শ ছাত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে অফিস-আদালত, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, গ্রাম-শহর, লঞ্চ-স্টিমার ও দোকান প্রভৃতি স্থানে সর্বাবস্থায় ময়লা-আবর্জনাতে ভর্তি থাকে, যা সম্পূর্ণটাই অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং জীবনকে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধময় করতে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যরূরী।

**উপসংহার :**

ইসলাম একটি সৌম্যতাপূর্ণ শান্তিময় জীবন বিধান। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাবস্থায় চির কল্যাণকর ও হিতকর। ইসলামের আদর্শ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় ও পালনীয়। আর বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হলেন সেই আদর্শের মূর্তপ্রতীক। বিশ্ব মানবতার সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল ইসলামী আদর্শ তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ নিঃশর্তে ও নির্বিঘ্নে অনুসরণ ও প্রতিপালন করা। আর কায়িক বা ক্রিয়াবাদী আদর্শ সমূহের অন্যতম আদর্শ হ'ল ত্বাহারাতের আদব বা পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার, যা মুসলিম জীবনের সকল ইবাদত সম্পাদনের মৌলিক দাবী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তার নিয়ম-কানূন ও পদ্ধতি সমূহ অতি সুন্দরভাবে নির্দেশিত হয়েছে। উপরে আলোচিত বিষয়গুলো সেখান থেকেই সঞ্চিত মুক্তমালা। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অশান্ত ও মতবাদ বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আদর্শ তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। আর পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার তারই অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুসরণ ও প্রতিপালন করা যরূরী কর্তব্য।

***[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]***

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণবাদ।

*-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

৮৩. আবুদাঊদ ১/৭ পৃঃ, হা/৪৫; ইবনু মাজাহ ১/৩০ পৃঃ, হা/৩৫৮,৩৫৯; নাসাঈ ১/৯ পৃঃ, হা/৫০,৫১; মিশকাত হা/৩৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৩৩৩, ২/৬৬-৬৭ পৃঃ, হাদীছ হাসান।

৮৪. 'আওনুল মা'বুদ ১/৪৫ পৃঃ, হা/৪৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮৫. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৫ পৃঃ, হা/৩২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮৬. তিরমিযী ১/১২ পৃঃ, হা/৭; আবুদাঊদ ১/৫ পৃঃ, হা/৩০; মিশকাত হা/৩৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৩৩২, ২/৬৬ পৃঃ।

৮৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৭, ইরওয়া উল-গালীল হা/৫৩, মিশকাত হা/৩৭৪, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫, ২/৭০-৭১ পৃঃ; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/৯০, ১/৫৪ পৃঃ।

# ত্যাগের মহিমায় চির ভাস্বর ঈদুল আযহা : আমাদের করণীয়

-আব্দুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**কুরবানীর তাৎপর্য :**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় কুরবানীর তাৎপর্য চিত্রিত হয়েছে এভাবে-

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহ্র নামে জান কুরবানে
ঈদের পূতবোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

কুরবানীর প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও আত্মত্যাগের মহান ইতিহাস। যা যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতি ইবরাহীমী সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কুরবানীর স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলিম সমবেত হয় ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা ও মদীনায়। তারা জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে ইবরাহীমী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার চেষ্টা করেন। হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ, যা প্রতি বছর আমাদেরকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করে। অতএব কুরবানীর মৌলিক তাৎপর্যকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :

(ক) কুরবানী, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রিয় বস্তু অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার উৎসব। মূলতঃ নিজের যা কিছু আছে সে সবই মহান আল্লাহ্র নিকট সমর্পণের নামই হচ্ছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‘(হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত, আমার মউত সব কিছুই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত’ *(আন‘আম ৬/১৬২)*।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবাদ পুরুষ ইবরাহীম (আঃ) ত্যাগের যে মহত্তম সুন্নাহ প্রবর্তন করে গেছেন, ঈদুল আযহা সে অনুপম ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণ করার উৎস।

(খ) ইসলাম শব্দের এক অর্থ ‘পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ’। আল্লাহ বলেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ‘বেদুঈন আরবরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি’ *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

এ আত্মসমর্পণ কিভাবে কতটুকু করতে হবে, এর বাস্তব অনুশীলন কেবল ঈদুল আযহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সে প্রক্রিয়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সূরা আছ-ছাফফাতের ১০৩ নং আয়াতে। শুধু মুখে আত্মসমর্পণ নয়, মহান আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও সন্তুষ্টির সামনে নিজেকে কিভাবে সমর্পণ করতে হবে, তারও বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ঈদুল আযহার এই উৎসব থেকেই। নিজের পসন্দ-অপসন্দকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সামনে বিসর্জন না দিয়ে স্থূল উৎসবে মত্ত হওয়া তথা মনের ভিতর লুক্কায়িত প্রবৃত্তি নামক পশুবৃত্তিকে মুক্ত ছেড়ে দিয়ে নিরীহ একটা পশুর গলায় ছুড়ি চালানো কোন অবস্থাতেই ঈদুল আযহার শিক্ষা হতে পারে না। এটা প্রকারান্তরে প্রবৃত্তি পূজারই নামান্তর।

(গ) উত্তম খানা-পিনার মাধ্যমে ঈমানদারগণের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়া। প্রকৃত মানবতাকে এ ধারায় আবার কায়েম করা। আমাদের আশেপাশে গরীব-অসহায় ব্যক্তি, যারা অর্ধ-অনাহারে দিনাতিপাত করছে। মানুষের সামান্য দয়া করুণার উপর যাদের জীবন চলে, আমাদের উঁচু তলার লোকদের তাদের নিয়ে ভাববার এতটুকু ফুরসত হয় না। শুধু তাদের অসহায়ত্ব আর গরীবী হালের বর্ণনাকে পুঁজি করে মঞ্চ-ময়দান আর টকশোতে তথাকথিত মানবতার ধ্বজাধারীরা সস্তা বাহবা কুড়ান। মানবতার বড় বড় বুলি আউরান। মহান আল্লাহ ঈদুল আযহার এ কুরবানীর উৎসবের মাধ্যমে এ সকল গরীব-অসহায়ের অন্নসংস্থান করেন। যাতে তারা অন্তত এ দিন ধনাঢ্যদের মত কিছুটা হলেও তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারে। তাদের ঘাটতি হয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় আমিষের যোগান হয়।

প্রশ্ন হল, আমরা কী শুধু কুরবানীর সময়েই গরীব-অসহায়কে আহার করানোর কথা ভাবব? আর বছরের বাকী দিনগুলোতে তাদের ভুলে থাকব। না, অবশ্যই না। কুরবানী একটি প্রতিকী বিধান মাত্র। সারা বছরই আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের আশায় নিজ সম্পদ গরীব-অসহায়দের কল্যাণে উৎসর্গ করার মধ্যেই প্রকৃত মানবতা নিহিত। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে উঠে তবে বুঝতে হবে, কুরবানীর ঈদ স্বার্থক হয়েছে। এখানেই কুরবানীর মূল তাৎপর্য নিহিত। নইলে এটি নামমাত্র একটি ভোগবাদী অনুষ্ঠানই থেকে যাবে। অতএব দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকল বিত্তশালী লোককে এগিয়ে আসতে হবে। সারা বছর, সারা জীবন সাধ্যমত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কথা বিবেচনা করে মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করতে হবে। মূলতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দৈন্য, হতাশা তা দূরীকরণের জন্য ঈদুল আযহার সৃষ্টি হয়েছে। তাই যারা অনাথ-পথশিশু, তাদের মুখে আনন্দ ফিরিয়ে দিতে ইবরাহীমী সুন্নাত কুরবানী-ই হোক আমাদের মূল প্রেরণা।

(ঘ) সভ্যতা কোন অবস্থাতেই ঐতিহ্যবিমুখতা নয়। বরং আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত মানুষ মহত্তর যা কিছু অর্জন করেছে, সেগুলোকে ধরে রেখে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে তোলাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। ঈদুল আযহা প্রতি বছর নতুন করে আমাদের সামনে এ শিক্ষায় তুলে ধরে। যারা আজ মুসলিম সোনালী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সেকেলে বা প্রাচীন বলে উপেক্ষা করতে চায় তাদের কছে প্রশ্ন, যখন আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার আদলে গড়া এ সমাজে ছয় বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষিতা হতে হয়, প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের বোনেরা এসিডদগ্ধ হয়, সামান্য স্বার্থের জন্য ভাই ভাইয়ের গলায় ছুড়ি চালাতেও দ্বিধা করে না, বাবা-মাকে পরম আদরের সন্তান-সন্ততিকে রেখে জীবনের সাঁঝ বেলায় বিদ্যাশ্রমে কাটাতে হয়, তখন কোথায় থাকেন মুখে কুলুপ এটে থাকা এসব পশ্চিমা সভ্যতার পৃষ্টপোষকরা? ইসলাম বিষয়ে এলার্জিতে পাওয়া এসব

তথাকথিত আধুনিক সভ্যদের কাছে অনুরোধ, আল্লাহভীতির আদলে গড়ে উঠা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতিকে একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন কি?

সুদূর অতীতে আল্লাহ্র খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর তরুণ পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ত্যাগ-তিতিক্ষার যে মহত্তম আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করেই আজ হজ্জ, কুরবানী এবং ঈদুল আযহা। মুসলিম মিল্লাতে ইবরাহীমীরই প্রদীপ্ত উত্তরাধিকার। এ মিল্লাতের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে, ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। ভোগ-লিপ্সা এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই ইবরাহীম (আঃ) ত্যাগ বা কুরবানীর ঐতিহ্য পরবর্তী অনুসারীদের জন্য রেখে গেছেন। উর্দূ কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

*আগার হো যায়ে ফের হাম মেঁ ইবরাহীম কা ঈমাঁ পয়দা*
*আগ মেঁ হো সেকতা হায় ফের আন্দা-যে গুলিস্তা পয়দা।*

'যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীমী ঈমান পয়দা হয় তাহলে অগ্নির মাঝে ফের ফুল বাগানের নমুনা সৃষ্টি হতে পারে' *(শিকওয়া ওয়া জওয়াবে শিকওয়া, মাকতাবাতুস সালাম প্রকাশনী, পৃঃ ৮০)*।

(ঙ) আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করা ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ্ মুসলিম জাতিকে সম্মানিত করে দু'টি ঈদ উৎসব দান করেছেন। আর এ দু'টি দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে ঈদুল আযহা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিনটি শুধু অপরাপর ধর্মীয় উৎসবের মতো আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এটিকে আনন্দ-উৎসবের সাথে সাথে মহান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে রঙ্গিন করতে হবে। যিনি জীবন দান করেছেন, সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন দান করেছেন। যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে থাকা হবে আর সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলবে এটা কি হয়? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা সু-সজ্জিত করেছে। অতএব আসুন! আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দশকে তাঁর তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠের মাধ্যমে তাঁর কৃত অনুগ্রহকে স্মরণ করি এবং বড়ত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

**কুরবানীর শিক্ষা :**

কবির ভাষায়,

'তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাধ'।

ঈদুল আযহার মহান উৎসব থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। যেমন-

(১) ঈদুল আযহা মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রতি আনুগত্য নবায়নের উৎসব।

(২) আল্লাহ্র আদেশকে মানুষের আবেগ, যুক্তি ও মানবীয় জ্ঞানের উর্ধ্বে কিভাবে স্থান দিতে হয়, এই কুরবানী আমাদের তাই শেখায়। সত্য প্রকাশ পেলে নিঃশর্তভাবে তা মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আবেগ, যুক্তি, পরিবেশ ও মানবীয় জ্ঞানের তোয়াক্কা করা যাবে না। কেননা এগুলো প্রকৃত সত্যের মানদণ্ড নয়।

(৩) মিল্লাতে ইবরাহীমের ভিত্তিই হচ্ছে কুরবানী। আর কুরবানীর অর্থ আল্লাহ্র দ্বীন ও তাঁর ইচ্ছার সামনে শর্তহীনভাবে নিজেকে সমর্পন করে দেয়া। আজকে ইবরাহীমী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশু কুরবানীর সাথে সাথে আমাদের দৃপ্ত শপথ নিতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জান, মাল সহ যেকোন সময় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। আর এটিই হল কুরবানীর মূল শিক্ষা। এই স্বর্ণোজ্জ্বল আদর্শ যুগে যুগে বিশ্ববাসীকে বার বার এ পরম সত্যটিকেই হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছে যে, আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই প্রকৃত মুমিনের কাজ এবং তাতেই নিহিত রয়েছে অশেষ কল্যাণ ও প্রকৃত সফলতা।

(৪) ইবরাহীম (আঃ)-কে ফেরেশতা কর্তৃক কুরবানীর জন্য দুম্বা প্রদান থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীতে কোন সময়েই মানুষকে কুরবানী দেয়া যাবে না। ইসলাম ব্যতীত অপরাপর ধর্মে নরবলীর প্রথা চালু ছিল। যেমন ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে মিসর বিজিত হলে, সেখানে নীল নদে জোয়ার আনার জন্য উত্তম কাপড় ও অলঙ্কার পড়িয়ে কুমারী মেয়েকে নীল নদে বলি দেয়ার প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ওমর (রাঃ) নদীতে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ফলে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়।[৮৮] তাছাড়া হিন্দু ধর্মে আজও নরবলীর প্রথা চালু আছে। এমনকি আমাদের দেশেও কখনও কখনও শোনা যায় যে, কিছু লোক ভণ্ডপীরের প্ররোচনায় পরে তার আদেশ মত নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৫) যারা দ্বীনের জন্য যথার্থ কুরবানী দিতে পারবেন, তাদেরই আল্লাহ পাক বিশ্ব জাহানের সকল মানব সন্তানের উপর ইমামত বা প্রাধান্য এবং আখেরাতেও পরিপূর্ণ মুক্তি প্রদান করবেন। মানুষ আল্লাহ্র জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে এ শিক্ষাই ইবরাহীম (আঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। মহানবী (ছাঃ) আমাদের জন্য ঐ ত্যাগের আনুষ্ঠানিক অনুসরণকে বিশষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর চূড়ান্ত ত্যাগের স্পৃহা গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ। একজন পিতা তাঁর পরম আদরের একমাত্র সন্তানকে শুধুই আল্লাহ্র আদেশে কুরবানী করতে এগিয়ে যাচ্ছে কী অপরূপ দৃশ্য! কেমন আত্মোৎর্গিত প্রাণ! কাজেই মুসলিমরা দুনিয়ার কোন কিছুকেই আল্লাহ্র চেয়ে যেন বেশী না ভালবাসে। তারা সব সময় তাদের অর্থ, শক্তি, সময় ও সম্পদের কিছু অংশ মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। এ শিক্ষা হোক আমাদের কুরবানীর মূল প্রতিপাদ্য।

**কুরবানীর আহকাম ও মাসায়েল :**

১. কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্তাবলী : কুরবানী কবুলের মৌলিক শর্ত দু'টি।

প্রথমতঃ ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা, কুরবানী যেন খাঁটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই হয়। তা না হলে আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। যেমন ইখলাছের অভাবে আদমপুত্র কাবীলের কুরবানী আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়নি।[৮৯] এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র কাছে ওগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত, রক্ত কিছুই পৌঁছে না বরং পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

দ্বিতীয়তঃ তা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহাফ ১৮/১১০)*।

তাছাড়া কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার বাহ্যিক কিছু শর্তও রয়েছে-

---

৮৮. ইবনু লাহিয়া, ফুতুহ মিসর, পৃঃ ১৫৭।
৮৯. সূরা মায়িদা ২৭ আয়াত।

(ক) এমন পশু দ্বারা কুরবানী দিতে হবে, যা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। যেমন- উট, গরু, দুম্বা, ছাগল, ভেড়া এগুলোকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়, 'বাহীমাতুল আন'আম'। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলো ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না।[৯০] উল্লেখ্য যে, এখানে মহিষ গরুর-ই এক প্রকার, এ জন্য মহিষকে গরুর আওতাভুক্ত ধরা হবে। যদিও মহিষের কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই মতানৈক্য করেছেন।[৯১]

(খ) কুরবানীতে ছাগলই উত্তম। কেননা মদীনায় থাকাকালীন রাসূল (ছাঃ) উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা 'খাসি' কুরবানী দিতেন।[৯২] তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হল উট অতঃপর গরু অতঃপর দুম্বা, ছাগল ও ভেড়া।[৯৩]

(গ) 'খাসি' কুরবানী করা জায়েয বরং উত্তম। 'খাসি' করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল এটা কোন খুঁৎ নয় আর অপসন্দনীয়ও নয়। বরং এর ফলে গোশত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।[৯৪]

(ঘ) কুরবানীর পশু 'মুসিন্না' হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন- لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা 'মুসিন্না' পশু ব্যতীত যবেহ করো না। তবে কষ্টকর হলে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার।[৯৫]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছর পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-বেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৯৬]

(ঙ) কুরবানীর পশু যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। এ পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া যরূরী। বারা ইবনে আযেবের হাদীছ অনুযায়ী চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা : অন্ধ, যার অন্ধত্ব স্পষ্ট; এমন রোগাক্রান্ত, যার রোগ স্পষ্ট; পঙ্গু, যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত, যার কোন অংগ ভেঙ্গে গেছে। তবে নাসাঈর বর্ণনায় 'আহত' শব্দের স্থলে 'পাগল' শব্দের উল্লেখ আছে।[৯৭] এখানে প্রকাশ্য দৃষ্টিহীনতা দ্বারা পশুর এমন অবস্থা উদ্দেশ্য, যা থেকে সম্পূর্ণ চোখ বিকল হয়ে যাওয়া বুঝায়। আর যদি তার চোখে শুধু দাগ পড়ে আর সম্পূর্ণ চোখ বিকল হয়ে না যায় সেক্ষেত্রে তা দ্বারা কুরবানী বৈধ।[৯৮]

**২.** কুরবানী দাতার যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকা যরূরী : সুন্নাহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত কুরবানী দাতার পক্ষে চুল, নখ প্রভৃতি কর্তন থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন- إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হতে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হতে বিরত থাকে।[৯৯] কুরবানীদাতার প্রতি চুল ও নখ না কাটার নির্দেশে কি হিকমত রয়েছে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক কথা বলেছেন।

ইমাম নববী বলেন, যাতে অকর্তিত নখ-চুল সহ পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়ে মুমিন বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়।[১০০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কুরবানীদাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কুরবানী করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী (ত্যাগ) করার অভ্যস্ত হতে পারেন এ জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১০১]

**৩.** নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট : আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে এরশাদ করেন, وَنَحَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا 'নবী (ছাঃ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানী করেন এবং মদীনাতেও হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন'।[১০২]

মিখনাফ ইবনু সুলাইম (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً 'হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও 'আতীরাহ'। ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ প্রদানের বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়'।[১০৩]

**৪. শরীকি কুরবানী :**

মূলতঃ শরীকি কুরবানীর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ওলামাগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ বলছেন, শুধু সফরের অবস্থায় একটি কুরবানীতে সাতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে, মুকীম অবস্থায় নয়। আবার একদল বলছেন, মুকীম অবস্থাতেও একটি কুরবানীতে সাতজন অংশগ্রহণ করতে পারে। আসুন! নিম্নে এ বিষয়টি নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করে দেখি।

---

৯০. ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ২/২২৩ পৃঃ।
৯১. আহকামুল উযহিয়্যাহ ১/৫১ পৃঃ; হেদায়া ৪/৪৩৫ পৃঃ।
৯২. সুবুলুস সালাম শারহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৫ পৃঃ।
৯৩. মির'আতুল মাফাতীহ শারহ মিশকাতুল মাছাবীহ ৫/৮০ পৃঃ।
৯৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১০/১২ পৃঃ; মিরকাতুল মাফাতীহ শারহ মিশকাতুল মাছাবীহ ৩/৫১৩ পৃঃ।
৯৫. মুসলিম হা/১৯৬৩; আবুদাউদ হা/২৭৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪১; নাসাঈ ২/২১৮ পৃঃ।
৯৬. মিরকাত ২/৩৫২; মির'আত (লাক্ষ্মী), ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ; গৃহীত : মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ১৫।
৯৭. তিরমিযী হা/১৫৪৬; নাসাঈ হা/৪৩৭১; সনদ ছহীহ।
৯৮. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/১২৮ পৃঃ।
৯৯. মুসলিম হা/১৯৭৭; আবুদাউদ হা/২৭৯১; তিরমিযী হা/১৫৩০; নাসাঈ হা/৪৩৬৪; ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৯; মিশকাত হা/১৪৫৯।
১০০. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৩৩ পৃঃ।
১০১. ইবনু উছাইমীন, আহকামুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ৭৭।
১০২. বুখারী হা/১৭১২ ও ১৭১৪।
১০৩. আবুদাউদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; নাসাঈ হা/৪২২৪; ইবনে মাজাহ হা/৩১১৫; আহমাদ ৪/২১৫ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৭৮, সনদ ছহীহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً ‘আমরা রাসূলের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম’।[১০৪]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ ‘একটি গরু ও উটে সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে’।[১০৫]

**পর্যালোচনা :**

এখানে ইবনু আব্বাসের হাদীছটি তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ এবং জাবের বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাউদে সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ‘কুরবানীতে শরীক হওয়া’ অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী (রাঃ) থেকে মোট তিনটি হাদীছ সংকলন করেছেন। যার মধ্যে দু’টি সফরের কুরবানীর সাথে সম্পৃক্ত এবং একটি ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছ।[১০৬] এছাড়া ইবনু মাজাহ উক্ত শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবির, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রাঃ) হতে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৫) এনেছেন, তার সবগুলোই সফরের কুরবানী সংক্রান্ত। এখানে উপস্থাপিত প্রমাণাদিকে একটু বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হয় যে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত আবুদাউদের ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটির কারণেই মূলতঃ মুসাফির ও মুক্বীম অবস্থায় কুরবানীতে ভাগাভাগি নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমতঃ এ হাদীছটিতে কেবল বলা হচ্ছে, ‘গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন’ এর কথা। এখানে সফর না মুক্বীম অবস্থায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অন্যান্য হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয়তঃ জাবির বর্ণিত সফরের হাদীছগুলো ইমাম আবুদাউদ যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এ হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্বসম্মত রীতি। তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কখনো ভাগা কুরবানী দিয়েছেন মর্মে সুস্পষ্ট ছহীহ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং কয়েকটা যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে একাকী ছিল। যেমনটি কিছু পূর্বে বুখারী ও আবুদাউদে বর্ণিত আনাস ও মিখনাফ ইবনু সুলাইমের হাদীছ থেকে জানতে পেরেছি। এছাড়া ছাহাবায়ে কেরামের মাঝেও প্রত্যেক পরিবার পিছু একটি করে কুরবানীর প্রথা চালু ছিল। আবু আইয়ূব আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ‘একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করত। অতঃপর তা নিজে খেত এবং অন্যকে খাওয়াত এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে এভাবেই চলে আসছে, যেমন তুমি দেখছ’।[১০৭]

প্রশ্ন হল, জগৎবিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, যেমন আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী, শাইখ বিন বায, শাইখ উছাইমীন সহ পূর্ববর্তী ইমাম তিরমিযী, ছুফইয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমাদ ও ইসহাক্বের মত যুগশ্রেষ্ট আইম্মায়ে কেরামের কেউ শরীকি কুরবানীর আলোচনায় সফরের শর্ত আরোপ করেননি। তারা আমভাবে সাত ভাগার বিষয়ে বৈধতা দিয়েছেন। তাহলে আমরা কেন এত বছর পর এসে খাছ করছি?

উত্তর হল, যেহেতু তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনাই করেননি, সেখানে কিভাবে বুঝব তাঁরা মুক্বীম অবস্থায় সাতভাগের পক্ষে মত দিয়েছেন! হতে পারে বিগত বিদ্বানদের যুগে মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানীর প্রশ্ন উত্থাপিত-ই হয়নি।

আবার যদি বলা হয়, মুক্বীম অবস্থায় সাতভাগা কুরবানী চলবে না মর্মে রাসূল থেকে তো কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না। উত্তরে বলব, এ ব্যাপারে রাসূলের কোন নির্দেশ বা আমলও তো নেই। অথচ কুরবানী হল একটি ইবাদত। যা রাসূলের তরীকা অনুযায়ী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি বলে যে, ভাগা কুরবানীর বিষয়ে মুসাফির ও মুক্বীমের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকত তবে অবশ্যই তা নবী করীম (ছাঃ) উম্মতকে জানিয়ে দিতেন। যেমন সফর ও মুক্বীম অবস্থায় ছালাতে পার্থক্য আছে বলে রাসূল (ছঃ) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এর জবাবে বলা চলে, ইসলামের কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে, কোন বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতপার্থক্য হলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরব। তিরমিযীর হাদীছে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সন্দেহপূর্ণ বিষয় ত্যাগ করে নিশ্চিত বিষয়ের দিকে ফিরব। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল একাকী কুরবানী দেওয়া। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে মুক্বীম অবস্থায় একাকী কুরবানী দেয়ার বিষয়টি যখন স্পষ্ট, সকল ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত এবং ভাগা কুরবানীর বিষয়টি অস্পষ্ট, সন্দেহপূর্ণ এবং মতবিরোধপূর্ণ। আর যখন শরী‘আতের মূলনীতি হল, ‘সন্দেহপূর্ণ উৎস থেকে দলীল গ্রহণ করা বাতিল’, তখন অধিক উত্তম হিসাবে মুক্বীম অবস্থায় একাকী কুরবানীর বিধানকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সাথে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির জন্য যেহেতু ইজতিহাদের দরজা খোলা, সেহেতু এ বিষয়ে অহেতুক ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়া অবশ্য বর্জনীয়। আল্লাহ্ই অধিক অবগত!

**৫. কুরবানীর গোশত বণ্টনের পদ্ধতি :**

মহান আল্লাহ বলেন, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ‘অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও’ *(হজ্জ ২২/২৮)*। রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর গোশত সম্পর্কে বলেন, كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ‘তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর’।[১০৮]

এখানে ‘আহার করাও’ বাক্য দ্বারা অভাবগ্রস্তকে দান করা ও ধনীদের উপহার হিসাবে দেওয়াকে বুঝায়। কতটুকু নিজেরা খাবে, কতটুকু দান করবে আর কতটুকু উপহার হিসাবে প্রদান

১০৪. তিরমিযী, (আশরাফী ছাপা, দেওবন্দ ভারত) ‘কুরবানীতে শরীক হওয়া’ অধ্যায় ২/২৮৬ পৃঃ, হা/১৫০১; নাসাঈ হা/৪৩৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; আহমাদ ১/২৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৬৯।

১০৫. মুসলিম হা/১৩১৮; আবুদাউদ, কিতাবুয যাহায়া ২/৩৮৮ পৃঃ, হা/২৮০৮, আশরাফী ছাপা।

১০৬. আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৮৭-৮৮ পৃঃ।

১০৭. ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬; ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬।

১০৮. বুখারী, ‘কুরবানী’ অধ্যায়, হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭১।

করবে এর পরিমাণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট কোন বক্তব্য না থাকায় ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।

কুরবানীর গোশত মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ নিজে খাবে, একভাগ গরীব অসহায়কে ছাদাক্বা করবে এবং আরেক ভাগ সংরক্ষণ করে রাখবে। জমহূর বিদ্বানের নিকটে নিজে খাওয়া, অপরকে খায়ানো এবং সংরক্ষণে রাখার বিধান সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। তবে কেউ যদি পুরাটা ছাদাক্বা করতে চায়, তবে সেটাও পারে। যেমনটি ইমাম শাফেঈ (রহঃ) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০৯]

কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। 'কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না' বলে যে হাদীছ রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তবে ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এ বিষয়ে একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে তবে যতদিন ইচ্ছা সংরক্ষণ করে খেতে পারে'।[১১০]

**৬.** মৃত ব্যক্তির নামে পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি কুরবানী দিয়েছেন বলে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১১১] অন্য কোন ছাহাবী রাসূলের জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী দিয়েছেন বলে জানা যায় না। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[১১২]

**৭. কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ :**

কুরবানীর পশু থেকে চামড়া, চুল, গোশত, হাড়-হাড্ডি সহ কোন কিছুই বিক্রয় করা বৈধ নয়। আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এতে আশ্চর্যবোধ করেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে, কুরবানীকারী ইচ্ছামত তা থেকে বিক্রি ও তার মূল্য থেকে ছাদাক্ব করতে পারে।[১১৩] কিন্তু এটা ঠিক নয়।

আজকাল বিভিন্ন শহর অঞ্চলে পেশাদার ভিক্ষুক ও তাদের সহযোগীদের অধিক পরিমাণ গোশত সংগ্রহ করে তা পরবর্তীতে বাজারে অল্প দামে বিক্রি করতে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এটা ন্যাক্কারজনক কাজ। এ ধরনের গর্হিত ব্যবসা থেকে তওবা করা উচিৎ।

**৮.** কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশু বিক্রি বৈধ নয়। অনোত্তমটা বিক্রি করে উত্তমটা ক্রয় করাও বৈধ নয়। যেহেতু কুরবানীর ইচ্ছাপোষণকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র জন্য তা উৎসর্গ করেছেন তাই ওয়াকফের মত এতেও বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে এক্ষেত্রে কাযী আয়ায, 'আতা, মুজাহিদ ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তার চেয়ে উত্তমটা ক্রয়ের জন্য বিক্রয় করা জায়েয বলেছেন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা। যা ঠিক না। কেননা রাসূল (ছাঃ) এখানে আলীকে ছাওয়াবের ভাগী করেছিলেন মাত্র।[১১৪]

**৯.** কুরবানীর পশু যবেহকারীকে তার মজুরী হিসাবে কুরবানীর গোশত বা চামড়ার অর্থ থেকে মজুরী দেওয়া বৈধ নয়। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী প্রদান করতেন। তবে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হলে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেয়াই দোষ নেই।[১১৫]

**১০.** রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে বের হতেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[১১৬]

**১১.** কুরবানীর ঈদ সামনে রেখে অবৈধ পন্থায় গরু মোটা তাজাকরণ অবৈধ। ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে পামবড়ি বা অনুরূপ কিছু খাইয়ে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া মোটাতাজা করণের প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রতারণার শামিল। অথচ রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/২৯৬)*। ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে কিছু গবাদিপশু ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় এ ধরনের অসুদোপায় অবলম্বন করে থাকে। এসব পশুর গোশত মানুষের স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকারক।

**বিবিধ মাসায়েল :**

**(১) ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করে চলা :**

কেননা রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহে যাওয়া আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করতেন।[১১৭] ইমাম শাফেঈ বলেন, ইহা ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য মুস্তাহাব। ইবনে হাজার বলেন, রাস্তা পরিবর্তনের হিকমাত ও উপকারিতা বিষয়ে আমার কাছে বিশটি বক্তব্য পৌঁছেছে। যেমন এ বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে পথগুলো তাদের জন্য সাক্ষ্য হয়ে থাকে। তাদের মাঝে মর্যাদাগত দিক দিয়ে সাম্যতা ফিরে আসে। কেউ বলেন, যেহেতু প্রত্যেক রাস্তায় ফেরেস্তাগণ অবস্থান নেন, সেহেতু তাদের সকলকে সাক্ষ্য রাখার জন্য রাস্তা পরিবর্তনের এ বিধান ইত্যাদি।[১১৮]

**(২) মাঠে ঈদের ছালাত জামা'আতসহ আদায় করা :**

খোলা মাঠে বা ময়দানে ঈদের ছালাত জামা'আতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা ঈদের ছালাত ময়দানে পড়তেন। অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ বেশী নেকী এবং অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেননি।[১১৯]

**(৩) ঈদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ :**

উম্মে 'আতিইয়া (রাঃ) বলেন,

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

'আমাদের নির্দেশ দেওয়া হত, আমরা যেন ঋতুমতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যায়।

১০৯. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/১৩৪ পৃঃ; ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামেশক, সিরিয়া : দারুল ফিকর প্রকাশনী) ৪/২৭৩৯ পৃঃ।
১১০. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১০/২৮ পৃঃ।
১১১. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৯৫; যঈফ আবুদাউদ হা/২৭৯০।
১১২. তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৭৯ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ২৪।
১১৩. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩৭৯ পৃঃ; আল-মুগনী ১৩/১৩৬ পৃঃ।
১১৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/১৩৭ পৃঃ।
১১৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/১৩৫ পৃঃ।
১১৬. বুখারী হা/৯৩৫; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬।
১১৭. বুখারী হা/৯৮৬; তিরমিযী হা/৫৪১; ইবনে মাজাহ হা/১৩০১; মিশকাত হা/১৪৩৪।
১১৮. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৩৬ পৃঃ।
১১৯. ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩৭ পৃঃ।

যেন তারা মুসলিমদের জামা'আত ও দো'আয় শরীক হতে পারে। তবে ঋতুমতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈক মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে।[১২০] আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ হাদীছে ওযর না থাকা প্রত্যেক মুসলিম নারীকে ছালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। আর যার ওযর আছে অর্থাৎ ঋতুমতী, তাকে দো'আয় অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ যামানায় ফেৎনার আশঙ্কায় অনেকে অনুমতি দিয়েছেন আবার অনেকে দেননি।[১২১]

অতএব আমাদের উচিৎ হবে উত্তমভাবে ঈদগাহ মাঠে পর্দার ব্যবস্থা করে মহিলাদের মাঠে এসে ছালাত আদায়ের সুযোগ করে দেওয়া। সামান্য ফিৎনার আশঙ্কার অজুহাতে যুগ যুগ ধরে মহিলাদেরকে এহেন আবশ্যকীয় কাজ থেকে বিরত রাখা কতটা যৌক্তিক তা ভাববার বিষয়। তাছাড়া ফিৎনার আশঙ্কা, তা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায়ও ছিল। প্রয়োজনে আমরা তাদেরকে পুরুষদের কিছুটা পূর্বে প্রস্থানের অনুমতি দিতে পারি, যাতে মোটেও ফিৎনার আশঙ্কা না থাকে। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন।

উল্লেখ্য যে, এ দেশের বিভিন্ন মসজিদে মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এভাবে মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত হয়েছে মর্মে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাই সাধারণ ছালাতের উপর কিয়াস করে ঈদের ছালাতে মহিলার ইমামতিকে যায়েয বলা অযৌক্তিক। কারণ এটা শরী'আত, এখানে সকল বিষয়ে স্পষ্ট দলীল থাকা চাই। তাই এমন জামা'আত করা যদি খুব প্রয়োজন হয়েই থাকে, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে পুরুষের ইমামতিতে ছালাত আদায় করতে হবে অথবা কুরআনে অভিজ্ঞ কোন নাবালেগ ছেলে দ্বারা ছালাতের ইমামতি করাতে হবে। যাতে কোন ফিৎনার আশঙ্কা না থাকে।

**(৪) ঈদ উপলক্ষ্যে পরস্পর মুবারকবাদ জ্ঞাপন :**

ঈদের দিন পরস্পর সাক্ষাতের সময় মুসলিমরা একজন অপরজনকে 'ঈদ মুবারক' বলে অভিবাদন জানাবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই। ঈদের দিন মুসলিমরা কিভাবে পরস্পর অভিবাদন জ্ঞাপন করবে এ প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم بعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا و منكم و أحاك عليك و نحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة انهم كانوا يفعلونه.

'ছাহাবায়ে কেরাম যখন ঈদের দিনে ছালাতের পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হত, তখন মুবারকবাদ জ্ঞাপনার্থে বলতেন, (تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكُمْ) অর্থ : আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ঈদ কবুল করুন। অথবা (أَحَاكَ عَلَيْكَ) বলতেন। ইহা রাসূলের একদল ছাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যারা এর উপর আমল করতেন।[১২২] এ ছাড়া ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم بعض تقبل الله منا و منك.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যখন ঈদের দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন তখন বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَ مِنْكَ 'আল্লাহ আমার ও আপনার পক্ষ থেকে এ ঈদকে কবুল করুন'।[১২৩] তাছাড়া ইবনু কুদামা স্বীয় গ্রন্থ আল-মুগনী (২/২৫৯ পৃঃ)-এর মধ্যে অনুরূপ হাদীছ আবু উমামাহ ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি মুসনাদে আহমাদ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাকে আবু উমামার হাদীছ শক্তিশালী করে।[১২৪] উল্লেখ্য যে, কেউ যদি 'ঈদ মুবারক'-কে ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ না করে শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং সাথে সাথে এই দো'আটি পাঠ করে যা ছাহাবায়ে কেরাম পড়তেন, তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। এটা হতে পারে পরস্পর সরাসরি সাক্ষাতের সময় অথবা মোবাইলের মেসেজ বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদানের সময়।

(৫) ঈদুল আযহার দিন এবং তার পরের তিন দিন পরস্পরের বাড়ীতে খানা-পিনা, নির্দোষ খেলাধুলা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করা যাবে।[১২৫]

উল্লেখ্য যে, ঈদের খুশীতে গান-বাজনা, পটকাবাজী, মাইকবাজী, ডিস এন্টিনার মাধ্যমে অশ্লীল চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠানমালা দেখা, সিনেমা হলে গিয়ে বাজে অশ্লীল সিনেমা দেখা এবং আনন্দ-বিনোদনের নামে বিভিন্ন পার্কে গিয়ে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিনোদনের আয়োজন করতে হবে।

(৬) বছরে ৫ দিন ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ : দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন **১১, ১২** ও **১৩** যিলহজ্জ খানাপিনার দিন।[১২৬]

**উপসংহার :**

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম ধর্ম মানবতার ধর্ম, কল্যাণের ধর্ম। মানবতার কল্যাণকে ঘিরেই ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুন আবর্তিত হয়। আজ ইবরাহীমী চেতনায় আলোকিত হয়ে মানবতার পাশে দাঁড়াতে হবে। যাতে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মিছিল প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর না হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অসহায় মানুষগুলো দুর্গন্ধময় ডাস্টবিনের দিকে আর ছুটে না যায়। যে গরীব অসহায় মানুষগুলো সারা বছর অর্ধ-অনাহারে দিন কাটায়, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটে চলে, সামান্য খাবারের খোঁজে। ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুল আযহার এ মহান দিনে তাদেরকে নিয়ে আমরা কী একটু ভাবতে পারি না? সারা বছর তাদের পাশে থাকব এ দৃপ্ত শপথ কী নিতে পারির না? তাই ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোক প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে মানবেতর জীবন ওঠে আসুক মানুষের কাতারে। মহান প্রভুর কাছে এ কামনাই রইল। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক-আমীন!!

***[লেখক : আরবী বিভাগ, ২য় বর্ষ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও দাওরায়ে হাদীছ, ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]***

১২০. বুখারী হা/৯৭৪; মুসলিম হা/৮৮৩; আবুদাউদ হা/১১৩৬; তিরমিযী হা/৫৩৯; মিশকাত হা/১৪৩১।
১২১. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৪৮৩ পৃঃ।
১২২. ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৫৩ পৃঃ।
১২৩. ফাতহুল বারী ২/৫১৭ পৃঃ।
১২৪. তামামুল মিন্না, পৃঃ ২৫৪-২৫৬; ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৬০৯ পৃঃ।
১২৫. ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩২২ পৃঃ।
১২৬. ছহীহ মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৪৮ ও ২০৫০।

# ভারতীয় পানি আগ্রাসন : বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

-মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

**ভূমিকা :**

কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিভাষায় ভারত আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ। এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক বিন্যাস আমাদের অন্য কোনভাবে এ সম্পর্ককে ভাবার সুযোগ দেয় না। কিন্তু বন্ধুপ্রতিম (!) দেশটির অব্যাহত পানি-সীমান্ত-অর্থনৈতকি, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে কি-না, তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আর তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করছে শাসকগোষ্ঠীর আস্তিনের নীচে লুকিয়ে থাকা তাদেরই এদেশীয় এজেন্টরা।

সম্মানিত পাঠক! আমরা এর পূর্বে ভারতের নগ্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা পানি-সীমান্ত-অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক আগ্রাসন সম্পর্কে জানব। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কিভাবে বাংলাদেশের উপর পানি-সীমান্ত-ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞ পাঠকদের সম্যক ধারণা দেয়ায় আমাদের মৌলিক প্রচেষ্টা।

**পানি আগ্রাসন :**

আল্লাহ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবন রক্ষার জন্য যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে পানি অন্যতম। পানি আল্লাহ্র একটি বিশেষ নে'মত এবং মানুষের জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে 'পানি' শব্দটি ৩২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের এ পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোলিটার। তার মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ সমুদ্রের লোনা পানি। ওজন হবে প্রায় ১৩৭ কোটি ঘন কিলোলিটার। আর প্রায় ৩ কোটি ঘনকিলোলিটার পানি রয়েছে এন্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরুর পুরো বরফের স্তূপে আটকা। মানুষ সরাসরি চাষ-বাস, কলকারখানা বা খাওয়ার জন্য কাজে লাগাতে পারে মাত্র দুই লাখ ঘন কিলোলিটারের মতো পানি। এগুলো রয়েছে নদীতে, হ্রদে, মাটিতে ও হাওয়ায় *(নাজীর আহমদ, পানি আল্লাহর নেয়া'মত, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ৮)*।

মানুষের আর্থ-সামাজিক তৎপরতা পানিকে ঘিরেই প্রবহমান। পানি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যেখানে প্রানের স্পন্দন সেখানেই পানির প্রয়োজন। অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের আসল শক্তি পানির মধ্যে লুক্কায়িত। পানি নেহায়েত একটি সস্তা পণ্য নয়; এটা এখন আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে গণ্য। যে দেশে যত পানি সে দেশ তত ধনী। পানির যে কোন অর্থমূল্য থাকতে পারে অর্থাৎ পানি কিনে পান করতে হবে তা ছিল কিছুদিন আগেও চিন্তার বাইরে; কিন্তু পানি এখন তেলের চেয়েও একটি মূল্যবান পদার্থ। পানি এখন অনেক এলাকায় পানির দরে পাওয়া যাচ্ছে না। কিনতে হচ্ছে নগদ মূল্যে। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পানি সংকট দেখা দিবে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের অভাবে যুদ্ধও বেঁধে যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের ৮০টি দেশ পানি সমস্যার সম্মুখীন। পানির জন্য সংগ্রাম করছে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ' *(আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ ভারত অভিন্ন নদীর পানি সংকট, বিশ্ব সাহিত্য ভবন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ ১৫)*।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাঈল সেরাজেলদিন ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক রিপোর্টে বলেছিলেন, 'চলতি শতাব্দীতে বেশীর ভাগ যুদ্ধ হয়েছে তেল নিয়ে। আর আগামী শতাব্দীতে যুদ্ধ চলবে পানি নিয়ে' *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬)*। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি কোনদিন বাঁধে তবে সম্ভবতঃ পানির অধিকার নিয়েই বাঁধবে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের মানুষের জীবনে নদীর যে প্রভাব রয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তেমন নেই। আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষ নদীপথে গান গেয়ে তরী বেয়ে ভিন গাঁয়ে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করে আসছে। কিন্তু আজকাল তা আর সম্ভব নয়। নদ-নদী সব শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক নদীতে এখন বর্ষাকালেও নৌকা চলে না। নৌকার পরিবর্তে নদীতে মোটরগাড়ী চলে। নদী আমাদের দেশের মানুষের কাছে জীবনের মতই। যুগ যুগ ধরে নদী দিয়ে বয়ে চলেছে প্রাণের প্রবাহ। নদীসমূহ শুধু বঙ্গোপসাগরের দিকেই ছুটে যায়নি। সর্পিল গতিতে উঠে এসেছে আমাদের জীবনেও। সিক্ত করেছে আমাদের চিত্ত। নদী মরে গেলে বাংলাদেশ বাঁচবে কি করে? বাংলাদেশের মানুষ শতকরা ৮৫ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষিখাত থেকে। দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে পানির চাহিদাও। ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমিতে ফসল উৎপাদন করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা মেটানো খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রয়োজন জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পানির।

বাংলাদেশের মত পানির এত প্রাচুর্য পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। নদীমাতৃক এদেশের পানির অভাব কোন কালেই ছিল না। তারপরও পানি নিয়ে বর্তমানে এত সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক (!) দেশ ভারতের নির্লজ্জ পানি আগ্রাসন। পানি নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে আমাদের বন্ধুপ্রতিম (!) দেশটি।

সুধী পাঠক! পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ২৬৩টি Trans boundry (দুই দেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত নদী) নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার মধ্যে ৫৭টি Trans boundry নদী বাংলাদেশে অবস্থিত, যার ৫৪ টি ভারত হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন Trans boundry নদীর উপর মানুষ তার প্রয়োজনে বাঁধ নির্মাণ করে আসছে। আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত ৩৫টি Trans boundry নদীর উপর ৫০টির বেশী বাঁধ নির্মাণ করেছে। অথচ বাংলাদেশের সাথে কোন আলাপ আলোচনা না করে এবং আন্তর্জাতিক নদীনীতি সম্পূর্ণ লংঘন করেই। ভারত কর্তৃক এই ধরনের বাঁধ নির্মাণ করার ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ আজ বিপদাপন্ন ও সংকটাপন্ন *(ড. মুহাম্মাদ আখতাল ইসলাম চৌধুরী, টিপাইমুখ বাঁধ : বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপদ, মাসিক পৃথিবী, ২৮তম বর্ষ, সংখ্যা ১২, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃঃ ৬৩)*। অথচ ভারতের এই একতরফা আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের অসংখ্য ছোট নদী এখন একেকটি মৃত দেহ।

আর বৃহৎ চার নদী পদ্ম-মেঘনা-যমুনা-তিস্তা এখন চরম বিপর্যস্ত এবং আরও আক্রমণের মুখে নিমজ্জিত।

ভারতের এ পানি আগ্রাসন একদিকে যেমন বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে অন্যদিকে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে চাপের মুখে রেখে তাদের স্বার্থ আদায় করে নিতে চাইছে। আর ভারতের এ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিতে কর্মরত কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মকর্তা *(ড. তারেক শামসুর রহমান, ভারতীয় পানি আগ্রাসন : আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ, মাসিক আত-তাহরীক, ১১তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০০৮, পৃঃ ৭)*।

বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী নয় ভারত। বাংলাদেশে যখন পানির অভাবে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, ঠিক তখনই ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন উল্টো কথা। তিনি বলেন, 'বাংলদেশের পানির প্রাপ্যতা বড় কোন সমস্যা নয়; সমস্যা হল পানির ব্যবস্থাপনার'। এ মন্তব্য থেকেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যাকে কোনদিন সমস্যা হিসাবে দেখেনি; বরং উপহাস করেছে। যেখানে সার্কের আওতায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমস্যার একটি উদ্যোগ নেয়া যেত, সেখানে তা না করে সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে ভারত তার স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে চায়' *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭)*। বাংলাদেশের নদীগুলোর বেশির ভাগেরই উৎপত্তি স্থল ভারতের হিমালয়। আর এ কারণেই প্রায় সব নদী আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে পরিচিত। সব নদীর সাথে প্রতিবেশী বাংলাদেশ-ভারত-চীন ও নেপালের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিবেশীদের সাথে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ভারত নদীগুলোতে বাঁধ দেয় ও একতরফা পানি প্রত্যাহার করে। এ বিষয়ে চীন ও পাকিস্তানের অবস্থা অন্যান্য প্রতিবেশীর তুলনায় শক্তিশালী। 'সিন্ধু' নদের সমস্যা বহু আগেই পাকিস্তান ও ভারত সমাধা করেছে। বিশ্বব্যাংক তারবেলা ড্যাম (পাহাড়ী এলাকার নদীতে উঁচু বাঁধ) তৈরী করার ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে *(এরশাদ মজুমদার, ভারত নদী আইন মানছে না, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ১৬ মে ২০১৪, পৃঃ ৭)*।

সিন্ধুর মতো আরো অনেক আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে। এসব নদীর সমাধাই ভারত করতে চায় না। বরং প্রতিবেশীর অধিকারকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে একক সিদ্ধান্তে নানা ধরনের বাঁধ দিচ্ছে ও পানি তুলে নিচ্ছে। চীন-পাকিস্তান ছাড়া আর কোন প্রতিবেশীকে পাত্তা দিতে চায় না ভারত। ভারতের হাবভাব দেখে মনে হয় বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দিয়েছিল এই আশায় যে, সব দিক থেকে স্বাধীন দেশটাকে শোষণ করতে পারবে। (মূলতঃ স্বার্থলোভী ভারতের হস্তক্ষেপ ছিল প্রায় নিশ্চিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় লাভজনক বিনিয়োগ এবং সে বিনিয়োগের ফসল ভারত সূদে আসলে উঠিয়েছে।

**ভারত কর্তৃক নির্মিত প্রধান প্রধান বাঁধ সমূহ :**

**ফারাক্কা বাঁধ :** পাকিস্তান আমলে ভারত প্রথম ফারাক্কা বাঁধ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানের শক্তিশালী বিরোধিতার কারণে বাঁধের কাজ বন্ধ রেখেছিল। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই ভারত ফারাক্কা বাঁধের কাজ শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর সরকার এতে প্রতিবাদ করলেও ভারত তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। কারণ বাংলাদেশ তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ (!) প্রতিবেশী রাষ্ট্র *(এরশাদ মজুমদার, ভারত নদী আইন মানছে না, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ১৬ মে-২০১৪, পৃঃ ৭)*।

তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছিলেন, 'ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে মাত্র ১১ থেকে ১৬ হাযার কিউসেক (প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘণফুট পানি প্রবাহ) পানি কলিকাতা বন্দরের নব্যতা বজায়

ফারাক্কা বাঁধ

রাখার জন্য প্রয়োজন। তাই ফারাক্কা বাঁধ চালু করা দরকার এবং এটি পরীক্ষামূলক ভাবে মাত্র ৪১ দিন চলবে'। ইন্দিরার মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করে শেখ মুজিব রাযী হয়ে যান। কিন্তু ভারত ফারাক্কা ব্যারাজ (সমতলের নদীতে নিচু বাঁধ) চালু করার পর আর কোনদিন বন্ধ করেনি। তারা এ বাঁধের সুবাদে গঙ্গার উজানে বিহার ও মধ্য প্রদেশে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে থাকে। উজানে ইতিমধ্যে গঙ্গার ৩০টি শাখা নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থা চালাচ্ছে। এতে ফারাক্কা পয়েন্টে পানির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী সরকার একটা গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়াই ২০ বছরের চুক্তি করলেও শুষ্ক মওসুমে ভারত ফারাক্কার নিম্নাঞ্চলে বলতে গেলে সামান্য পানি দিচ্ছে। তবে তাদের চানক্য কূটকৌশলে বলে বেড়াচ্ছে ফারাক্কা পয়েন্টে প্রাপ্য পানি বাংলাদেশকে দিচ্ছে। অথচ আগে ফারাক্কা পয়েন্টে শুষ্ক মওসুমে পানি থাকত এক লাখ ৭০ হাযার কিউসেক। এখন সেখানে পানি পাওয়া যায় মাত্র ৩০ হাযার কিউসেক। ভারতের কূটনীতির মারপ্যাঁচে বাংলাদেশ আজ মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে *(প্রকৌশলী এস.এম ফজলে আলী, প্রবন্ধ : লংমার্চের চেতনা কি হারিয়ে গেল, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা ১৬ মে-২০১৪, পৃঃ ৭)*।

বাংলাদেশের ১৮ মাইল উজানে মনোহরপুরের কাছে নির্মিত এই বাঁধ এদেশের জীবন ও জীববৈচিত্রের জন্য হয়ে উঠেছে চরম হুমকি স্বরূপ। যদিও এই বাঁধ দেয়ার পরও কলকাতা বন্দরের নব্যতা রক্ষা হয়নি, বরং ফারাক্কা হয়েছে ভারতের নির্লজ্জ পানি আগ্রাসনের প্রতীক। দীর্ঘ ৪৪ বছরে ভারত কর্তৃক গঙ্গার একতরফা পানি প্রত্যাহারে শুধু বাংলাদেশের জীবন ও জীব বৈচিত্রই ধ্বংস করেনি, ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এদেশের হাযার বছর ধরে গড়ে উঠা কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য। ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের আগে খুলনার সর্বোচ্চ লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল ৫০০ মাইক্রোসম এবং ফারাক্কার প্রবাহ প্রত্যাহরের ফলে খুলনায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাযার ৫০০ মাইক্রোসম। এই লবণাক্ততা খুলনার উত্তরে ২৮০ কিঃমিঃ পর্যন্ত উজানে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের নদীর নব্যতা কমে যাওয়ায় সাগরের লবনাক্ততা সহজেই উপরে উঠে আসছে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি

ফারাক্কা বাঁধ

সমুদ্র থেকে শত শত মাইল দূরের গোপালগঞ্জ ও নড়াইল পর্যন্ত উঠে এসেছে। উপকূলের যেলাগুলোর অবস্থা আরো করুণ। উপকূলের লবণাক্ততা উঠে আসার কারণে স্বাদু পানির মাছের সংখ্যা ক্রমেই কমছে *(দৈনিক নয়াদিগন্ত, প্রবন্ধ : বাড়ছে লবনাক্ততা : ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র, ১৬ মে ২০১৪ বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ৭)*।

গাঙ্গেয় পানির ব্যবস্থায় দুই শতাধিক মিঠাপানির মাছ ও ১৮ প্রজাতির চিংড়ী লালিত হয়। এদিকে গঙ্গার প্রবাহ সংকটে নৌপরিবহণ ব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এখন শুষ্ক মওসুমে ৩২০ কিঃমিঃ বেশি প্রধান ও মধ্যম নৌপথ বন্ধ রাখতে হয়। ফলে শত শত মাঝি মাল্লা কর্মহীন হয়ে আছেন। আবার অনেকে বদলে ফেলেছেন পেশা। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে গঙ্গা অববাহিকায় অনেক নদী মরে গেছে। তাছাড়া শুকিয়ে গেছে এককালের প্রমত্তা, পদ্মা, খরস্রোতা ও যমুনা *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭)*।

ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ, যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রাজপথের এক অকুতোভয় বীর সেনানী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে উদাত্ত আহবান জানান গঙ্গার পানির ন্যায্য বাংলাদেশকে দেয়ার জন্য। ইন্দিরা আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর করেননি। এতে মাওলানা ভাসানী গণআন্দোলনের ডাক দিলেন। তিনি হুঙ্কার দিলেন ভারত পানির ন্যায্য হিস্যা না দিলে তিনি লংমার্চ করে ফারাক্কায় পৌঁছবেন। তখন বৃদ্ধ বয়সের কারণে শরীর খুবই অসুস্থ থাকলেও জাতির স্বার্থে তিনি লংমার্চের ঘোষণা দিলেন। সারা দেশ থেকে সর্বস্তরের মানুষ রাজশাহীতে গিয়ে হাজির হন। ১৬-মে (১৯৭৬) সকালে বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে মাওলানা কানসাটের (রাজশাহী) দিকে অগ্রসর হন। জনমসুদ্র মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছে "ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও, পানির ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে" *(প্রকৌশলী এস,এম ফজলে আলী, প্রবন্ধ : লংমার্চের চেতনা কি হারিয়ে গেল, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৬ মে ২০১৪, পৃঃ৭)*। সেইদিন কানসাট হাইস্কুলের জনাকীর্ণ সমাবেশে মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য আমাদের আন্দোলন। আমি জানি এখানেই শেষ নয়'। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আরো বলেন, 'ভারত সরকারের জানা উচিত বাংলাদেশীরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না; কারও হুমকিকে পরওয়া করে না। ...যে কোন হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের দেশত্মবোধক কর্তব্য এবং অধিকার' *(মরণ বাঁধ ফারাক্কা, মাসিক আত-তাহরীক ডেস্ক, ১৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০১০, পৃঃ ১৬)*।

ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারতের যে যাত্রা শুরু তা গত ৪৫ বছরের এমন স্থানে পৌঁছেছে যে বৃহৎ নদী পদ্মা ও পদ্মা সম্পর্কীত অসংখ্য ছোট নদী খাল-বিল বিপর্যস্ত। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদীর বড় অংশ শুকিয়ে গেছে। ভারসাম্যহীন পানি প্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের বিশাল অঞ্চলের কৃষি। সেচের জন্য চাপ বাড়ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর। যা দীর্ঘ মেয়াদে আরো জটিল পরিস্থিতি তৈরী করেছে। শুধু তাই নয় পদ্মা নদীর এই ক্ষয় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নদীগুলোকে দুর্বল করেছে। এই প্রভাব গিয়ে পড়েছে সুন্দরবন পর্যন্ত। সুন্দরবনের কাছে নদীর প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ায় লবণাক্ততা বেড়েছে। তাতে ক্রমাগত ক্ষয়ের শিকার হচ্ছে বনের জীবন। অন্যদিকে ফারাক্কার বিষক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও তার আশেপাশেও পড়েছে। বিহারের মানুষ শাবল নিয়ে মিছিল করেছে ফারাক্কার বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার দাবিতে *(অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ, প্রবন্ধ : চোখের সামনে খুন হচ্ছে নদী, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ১৩)*।

**টিপাইমুখ বাঁধ :**

এদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাংশে টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে আমাদের জন্য আরেক মরণফাঁদ তৈরী করা হয়েছে। বৃহত্তর সিলেটের উজানে সুরমা কুশিয়ারা ভারত সীমান্তে বরাক নদী থেকে বের হয়েছে। সেই বরাক নদীর ১০০ কিঃ মিঃ উজানে মনিপুরের টিপাইমুখে এক বিরাট বাঁধ তৈরী করেছে ভারত। এ বাঁধ দিয়ে তারা এক হাযার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। নদীর প্রবাহে কোন বাঁধা দিবে না। ভারতের একথা সত্য নয়। টিপাইমুখের ১০০ কিঃ মিঃ উজানে তারা আরেকটি ড্যাম তৈরী করেছে বরাক নদীর পানি সেচ করবে বলে। এতে টিপাইমুখের নিম্নাঞ্চলে পানি পাওয়া যাবে না। সুরমা কুশিয়ারা সহ মেঘনা অববাহিকায় সব নদী পানি শূণ্য হয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু ড্যামটি একটি টেকটোনিক প্লাটের ওপরে অবস্থিত হওয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেই ভূমিকম্পে ড্যাম ভেঙ্গে যাবে। তাতে নিম্নাঞ্চলে ২৫-৩০ ফুট পানির ঢল নামবে। তখন মানুষ পশুপ্রাণী বাড়িঘর সব খড়-কুটার মতো ভেসে যাবে। এই হলো আমাদের প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব *(প্রবন্ধ : লংমার্চের চেতনা কি হারিয়ে গেল, দৈনিক নয়াদিগন্ত ঢাকা, ১৬ মে ২০১৪, পৃঃ ৭)*।

টিপাইমুখ বাঁধের মানচিত্র

সিলেট যেলাটি দেশের পূর্ব উত্তরাঞ্চলে প্রথম গ্রেডের ভূমিকম্প প্রবণ জোনে অবস্থিত। এ অঞ্চলে ১৮৯৭ সালে রিখটারের প্রায় ৮ মাত্রায় প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। আর টিপাইমুখ বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাযুক্ত ভূমিকম্প প্রবণ বলয়ে

অবস্থিত। এ স্থানে ভূমির নিচে লুক্কায়িত রয়েছে কয়েকটি ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-গাঠনিক চ্যুতি (Geological and tectonical fauits)।

টিপাইমুখ বাঁধ

আমরা জানি, ভূ-তাত্ত্বিক সাবহিমালয় জোনে অবস্থিত টারশিয়ারি যুগের ঐ অঞ্চলের ধারে কাছেই ইন্ডিয়ান প্লেট, ইউরোশিয়ান প্লেট এবং বার্মিজ প্লেটগুলোর মধ্যে নিরন্তর সাংঘর্ষিক প্রক্রিয়া চলমান। বাঁধ নির্মানের ফলে কোটি কোটি টন পানির ওজনে এমন নাজুক এবং অস্থির ভূ-গাঠনিক ভূমিকম্প প্রবণ জোনে রিখটার স্কেলে ৭ ও ৮ কিংবা তদুর্ধ্ব মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের কারণ ঘটতে পারে এ টিপাইমুখ বাঁধ। আর এর ফলে বিপুল পানির জলাধার ভেঙ্গে কিংবা ভূমিকম্পের তরঙ্গের আঘাতে ঘনবসতিপূর্ণ সিলেট মহানগরীসহ সংলগ্ন অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারাতে পারে। ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পূর্বাঞ্চলের জীবনের স্পন্দন। পানি তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঐ অঞ্চলে বড় ধরনের জলবায়ু পরিবর্তকেও ডেকে আনবে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এছাড়াও এ বাঁধের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং জাতিসংঘ ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অন্তভুর্ক্ত সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড় সহ এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী নৌ-যোগাযোগ ও জলজসংস্কৃতি। এক কথায় টিপাইমুখ বাঁধের পারিবেশিক ভয়াবহতা ফারাক্কার ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে যৌক্তিকভাবে আশঙ্কা করা যায় *(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব, ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ : আরেক অভিশপ্ত ফারাক্কা, মাসিক পৃথিবী, ২৮তম বর্ষ, ১০ তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৯, পৃঃ ৬৬)*।

**গজলডোবা বাঁধ :**

বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প। ম্যাপ দেখলে দেখা যায় ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন স্থানে কাঁটার মত সব বাঁধ। তিস্তা নদীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ভাটির দেশকে না জানিয়ে গজলডোবা বাঁধ দিয়ে যেভাবে একতরফা পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে তা স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন *(অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ, চোখের সামনে খুন হচ্ছে নদী, দৈনিক প্রথম আলো ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ১৩)*।

বাংলাদেশের উত্তরাংশের একটি গুত্বপূর্ণ নদী তিস্তা নদী। তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী। এ নদী উত্তরে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সিকিম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পূর্ব নাম ছিল দিস্তাং বর্তমান নাম তিস্তা, যার সংস্কৃতকরণ হয়েছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি থেকে তিনটি স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতধারার নাম করতোয়া, মধ্যবর্তী স্রোতধারার নাম আত্রাই এবং পশ্চিমতম স্রোতধারার নাম পূর্ণভবা। ইতিহাসে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় অভিযান কালে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে) করতোয়া গঙ্গার প্রায় তিনগুণ ছিল।

ভারত তিস্তা নিয়ে অনেক কিছু করেছে। তিস্তার উপর ভারত অসংখ্য বাঁধ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, রিজারভার, গ্রোয়েন, স্পার নির্মাণের ফলে তিস্তা নদীর জীবন বায়ু বন্ধ হওয়ার পথে। তিস্তা নদীর ওপর তৈরী গজলডোবা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এ বাঁধের কারণে তিস্তা নদী পদ্মার ভাগ্যই বরণ করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক নদী তিস্তার উজানে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি যেলার 'গজলডোবা' নামক স্থানে ভারত নির্মাণ করেছে বহুমুখী ব্যারেজ। বাংলাদেশের তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকা থেকে ১২০ কিঃ মিঃ উজানে ভারত এই মরণ ফাঁদ তৈরী করেছে। ২২১ দশমিক ৫০ মিটার দীর্ঘ ৪৪টি গেট সমেত গজলডোবা বাঁধের রয়েছে ৩ টি পর্যায়। প্রথম পর্যায় সেচ প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায় পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং তৃতীয় পর্যায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল তৈরী করে নৌপথ সৃষ্টি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে আগেই। ১৯৮৭ সাল থেকে ৪৫ টি স্লুইস গেইটের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে তীব্র পানি সংকটে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও অকেজো হয়ে পড়েছে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প *(ড. মুহাম্মাদ নূর ইসলাম, তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, মাসিক পৃথিবী, ঢাকা, ১৪ জুলাই ২০১৪, পৃঃ ৫-৬)*।

তিস্তার পানি দিয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রায় আট লাখ হেক্টর জমিতে শুষ্ক মৌসুমে ধান ও অন্যান্য ফলাদি চাষ হত। ২০১৪ সালে তিস্তায় পানি নেই। শুষ্ক হয়ে মাটি ফেটে গেছে সর্বত্র। অন্যদিকে খবর আসছে ভারত পশ্চিমবঙ্গে আরো বাড়তি দেড় লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনছে তিস্তার পানি দিয়ে। একেই বলে, 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'।

বাংলাদেশের লালমণিরহাটে ডালিয়া পয়েন্টে ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পানির প্রবাহ ছিল ২৫০ কিউসেক। এ পানি তিস্তা নদীর সাথে সংযুক্ত ছোট নদীগুলোর পানি এবং ভারতের দেয়া গজলডোবা বাঁধের চোয়ানো পানি বললেই চলে। এমন মারাত্মক পরিস্থিতিতে তিস্তাচুক্তি সই না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প ব্যবহারের জন্য ও নদী রক্ষার জন্য 'ন্যায়সঙ্গত পানি' ছাড়তে ভারতকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দলের চিঠি চালাচালি করে ও বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরছে। ভারত বাংলাদেশের অনুরোধ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও পানি প্রবাহ ক্রমাগত কমছেই। ১৪ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, ভারত তিস্তা নদী থেকে আরো পানি উজানে সরাবে। এতো মরার উপর খাঁড়ার ঘাঁ। উজানে ভারত আরোও কৃষি জমিতে পানি নেবে। আরও বাঁধ দিবে। আরও পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করবে। পশ্চিমবঙ্গের সেঁচমন্ত্রী রাজীব বন্দোপাধ্যায় সম্প্রতি বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সেচ সুবিধা মেটানোর মতো প্রয়োজনীয় পানি তিস্তায় নেই। তাই তিস্তা থেকে পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত পানি প্রয়োজন। নিজেদের চাহিদা না মিটিয়ে বাংলাদেশকে পানি দেব কিভাবে'। এ মন্তব্যে মনে হয় দাদারা এতো দিন দয়া করে তিস্তার পানি আসতে দিয়েছিল। এতো আন্তর্জাতিক আইন, নিয়ম-নীতি, 'বন্ধুপ্রতিম' সম্পর্কের উল্টোচিত্র। তবে এটাই ভারতের স্বভাবিক নীতি *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭)*।

ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ তার প্রথম বিদেশে সফরে ঢাকায় এসে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পর্কে আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন *(দৈনিক প্রথম আলো, ২৯জুন ২০১৪, পৃঃ ১)*। এর পূর্বে ২০১১ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরে তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এক রোখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নির্লজ্জভাবে বলে বসলেন বাংলাদেশকে পানি দেয়া গ্রহণযোগ্য নয় *(দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১১ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ১)*। সেদিন এই মমতার বিরোধিতার কারণেই তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি ভেস্তে যায়। এদিকে বর্ষাকাল শুরু হতেই বাংলাদেশকে না জানিয়ে কোন ধরনের তথ্য-উপাত্ত না দিয়েই ভারত সবগুলো বাঁধের মুখ খুলে দিয়েছে। এতে করে আকস্মিক বন্যায় দেশের ২০টি যেলার লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। মানবেতর জীবন যাপন করছে প্লাবিত এলাকার মানুষ।

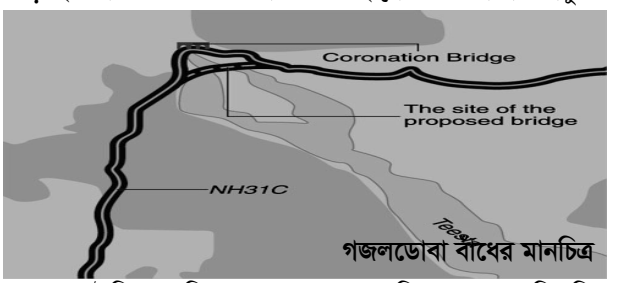

**গজলডোবা বাঁধের মানচিত্র**

ভারতের উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ও পশ্চিমঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই বন্যা চলছে। এই বন্যার পানি দেশটি খুলে দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভিতর ঠেলে দিচ্ছে। নব্যতা সংকটে ভোগা দেশের নদ-নদীগুলো ভারত থেকে ধেয়ে আসা এই পানির চাপ সামাল দিতে পারছে না। এতে করে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধরলা, ব্রক্ষ্মপুত্র, তিস্তা, করতোয়া, ইছামতি, সুরমা, কুশিয়ারা, কংশ, মহুরী ও নাফ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থানে নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তলিয়ে গেছে এসব নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চল, চর ও দ্বীপচর। পানির তোড়ে বেশ কয়েকটি এলাকার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তলিয়ে গেছে ক্ষেতের ফসল ও চিংড়ীর ঘের। ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় প্লাবিত এলাকার মানুষ উঁচু সড়ক ও বাঁধের উপর আশ্রয় নিচ্ছে। বন্যা কবলিত এসব এলাকার মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে খাবার পানি ও খাদ্য সংকট *(দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৭ আগষ্ট ২০১৪)*।

সুধী পাঠক! এখানেই শেষ নয় ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম নদী সংযোগ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ব্রক্ষ্মপুত্র ও গঙ্গার পানি ১৪টি নতুন খননকৃত খালের মাধ্যমে পশ্চিমের দক্ষিণ ভারতের দিকে প্রবাহিত করা হবে। এটি কার্যকর হলে অন্যান্য নদীর সাথে বাংলাদেশের আরেকটি বৃহৎ নদী যমুনা আক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যাবে অধিকাংশ নদী ও উপনদী। ভারত যেভাবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীগুলোর জীবন সংশয় ঘটাচ্ছে তা শুধু বাংলাদেশের নয় ভারতের জনগণের সর্বোপরি সমগ্র মানব সমাজের বড় ক্ষতি। বাংলাদেশ যারা পরিচালনা করেন তারা জনগণের স্বার্থ কেন্দ্রে রেখে উন্নয়ন নীতি সাজালে এই নদী ও খাল-বিলগুলোর জীবনও সচল করতেন এবং ভারতের এসব আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিপক্ষীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সে সব ভূমিকা নেই উল্টো তারা নদ-নদী-সুন্দরবন সবই ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সরকার নিজের অবস্থান পরিষ্কার না করে প্রস্তুতি না নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত তোয়াক্কা না করে 'ভারত কোন ক্ষতি করবে না' বলে শ্লোগান দিচ্ছে। 'কোন ক্ষতি হবে না' যদি বাংলাদেশ সরকার আগে বলতে থাকে তাহলে দর কষা-কষি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জনগণের উদ্বেগ বিবেচনার আর জায়গা থাকে কোথায়? *(চোখের সামনে খুন হচ্ছে নদী, দৈনিক প্রথম আলো-১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ১৩)*। ভারতীয় পানি আগ্রাসন যে, বাংলাদেশকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বন্যার সময় আমরা পানিতে ভাসছি আর খরার সময় পানির অভাবে শুকাচ্ছি এ উভয় সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ যদি শীঘ্রই কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে এ দেশ ২০৩০ সালের দিকে বসবাসের অনুপযোগী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে *(ড. তারেক শামসুর রহমান, ভারতীয় পানি আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ, মাসিক আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১৩)*।

**আমাদের করণীয় :**

উজানের কোন দেশ ভাটির দেশকে না জানিয়ে আন্তর্জাতিক নদীর পানি প্রত্যাহর করা জাতিসংঘ কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির সুস্পষ্ট লংঘন। অথচ ভারত প্রথম থেকেই ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে বিশ্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এ কাজটি করে যাচ্ছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে। এক্ষণে এ থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত করণীয়গুলো বিবেচনাযোগ্য।

(এক) ফারাক্কা, টিপাইমুখ ও গজলডোবা বাঁধসহ সমস্ত বাঁধের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনমত এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। কাদা ছোড়াছুড়ির বিভেদাত্মক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় স্বার্থে সরকারী ও বিরোধী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(দুই) চীন, নেপাল, ভারত, ও ভূটানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পানি সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা।

(তিন) দ্বীপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে চাপ প্রয়োগ করা, যাতে ভারত তার নব-পরিকল্পিত একতরফা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ বাতিল করে।

(চার) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা। মেকং নদী কমিশনের মতো বাংলাদেশও একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মেকং নদীর পানি কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনাম সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে নিচ্ছে। ইউরোপের দানিয়ুব নদীর পানি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ১২টি দেশ ভোগ করছে। নীল নদের পানি ভোগ করছে মিশর, সুদান ও ইথিওপিয়া এমনকি চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছ থেকে সিন্ধু নদের পানি ভারত ভোগ করছে ৩৪ বছর আগ থেকে। এ অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে।

(পাচ) ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে ৫ কোটি মানুষ গজলডোবা বাঁধের প্রভাবে ৪ কোটি মানুষ এবং টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাবে ৫ কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং বাংলাদেশের নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে। পরিবর্তিত হবে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। ধ্বংস হবে মানুষ, পশু-পক্ষী মাছ অন্যান্য সম্পদাদী। সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এগুলো ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় জনমত ও বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা একান্ত যরূরী।

***[লেখক : এম. এ. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রংপুর সাংগঠনিক যেলা]***

# গুম-খুন-অপহরণ : আতঙ্কিত দেশবাসী!

-আমীনুল ইসলাম

**ভূমিকা :**

হুমকির মুখে জননিরাপত্তা। এত খুন! এত রক্ত! এত আহাজারি! আমরা কোথায় যাচ্ছি? দেশ এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই পত্রিকার পাতা ভরে থাকছে গুম, খুন আর অপহরণের খবর। টেলিভিশনে নৃশংসতার নানা দৃশ্য আর স্বজনদের আহাজারি শুনতে শুনতে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এর শেষ কোথায়? দেশ কি সত্যিই এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হতে যাচ্ছে? নারায়ণগঞ্জের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম ও আইনজীবী চন্দন সরকারসহ সাত খুনের রেশ এখনো কাটেনি। যে ভয়ংকর ভাবনা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাহল ঘটনার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ। সর্বোচ্চ আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিযোগ তদন্তে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তদন্ত কমিটি গঠনসহ কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে উক্ত ঘটনার মূল হোতা নূর হোসেন পালাতে গিয়ে ভারতে গ্রেফতার হয়েছে এবং জড়িত থাকা কয়েকজন র‍্যাব সদস্য তাদের দোষ স্বীকার করেছে। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থেকে নিখোঁজ হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। ফতুল্লায় এক দম্পতিকে নিজ ঘরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঝিনাইদহে এক মোটর শ্রমিক নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্নস্থানে অপহৃত পাঁচজনকে উদ্ধার করার পাশাপাশি নতুন করে দুই স্কুল ছাত্রীসহ চারজনকে অপহরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামে অপহরণকারীরা ১২ বছর বয়সের জিহাদের একটি কিডনি কেটে নিয়েছে। দোহার ও কালিহাতিতে দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে। দৌলতপুর, মুন্সিগঞ্জ ও গাযীপুরে দুই গৃহবধুসহ তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রূপগঞ্জে ম্যানহোলে অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণীর অর্ধগলিত লাশ পাওয়া গেছে। নৃশংসতার যেন শেষ নেই। এভাবেই চলছে স্বাধীন বাংলাদেশ! হায়রে স্বাধীনতা!

**গুম-খুন-অপহরণের মহামারী :**

মহামারী শব্দের অর্থ কোন কিছুর ব্যাপক আকার ধারণ করা। ছোটবেলায় শুনতাম দেশে কলেরা, ডাইরিয়া, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে সারাদেশে যেন চলছে গুম-খুন আর অপহরণের মহামারী ও মহাতাণ্ডব। বিশেষ করে ঢাকা, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাগুলোতে চলছে ভয়ংকর তাণ্ডব। এছাড়া সারাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই দিনের পর দিন লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই মহামারীর আতংক থেকে মুক্তি চায় দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ জনগণ।

প্রশ্ন হল, কি কারণে অপহৃত হচ্ছে, কারা অপহরণ করছে, কোথায় নিয়ে রাখা হচ্ছে, কেন রাখা হচ্ছে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় দেশের জনগণ। কিন্তু কে দিবে এসব প্রশ্নের উত্তর! দেশের সরকার, প্রশাসন, না জনগণ?

**গুম-খুন-অপহরণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান :**

◈ প্রশাসনের হিসাব মতে জানুয়ারী থেকে মার্চ'১৪ এই তিনমাসে শুধু ঢাকায় অপহরণ হয়েছে ৫০ জন। তাছাড়া সারাদেশে অপহরণ হয়েছে ১৯৬ জন এবং খুন হয়েছে ১২৯০ জন।

◈ পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাব মতে ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে অপহরণ হয়েছে ঢাকাসহ সারাদেশে ৭৭ জন। ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৩ জন এবং মার্চ মাসে ৯৩ জন। চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে সারাদেশে মামলা রেকর্ড হয়েছে ১২৯০টি *(দৈনিক যুগান্তর, ৪ মে'১৪, পৃঃ ১৪)*।

◈ ডিএমপি কমিশনার মুনিরুল ইসলাম বলেন, ২০১৩ সালে ডিএমপি এলাকার ৪৯টি থানায় ৯৯টি অপহরণ মামলা হয়েছে। যার মধ্যে ৮১টি মামালার ভিকটিম উদ্ধার হয়েছে।

◈ মানবাধিকার কমিশনের হিসাব মতে, ২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে ৪২৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

◈ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০১৪ সালে সারাদেশে অপহরণ ও গুম হয়েছে ৬০ জন, ২০১৩ সালে ৬৮ জন, ২০১২ সালে ৫৬ জন, ২০১১ সালে ৫৯ জন এবং ২০১০ সালে ৪৬ জন *(দৈনিক যুগান্তর, ৪ মে'১৪, পৃঃ ১৪)*।

◈ মিডিয়ার হিসাব মতে গত দেড় মাসে শুধু নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ১৯ টি লাশ উদ্ধার হয়েছে।

◈ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে অপহৃত হওয়া ২৬৮ জনের মধ্যে ৪৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে। ২৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছে সোর্পদ করা হয়েছে ১৪ জনকে। বাকিদের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। প্রকাশিত অন্য খবর অনুযায়ী গত ৪ বছরে প্রায় সাড়ে তিন হাযার অপহরণের ঘটনা ঘটেছে, যাদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী মানুষ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল)*।

◈ মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেয়া পরিসংখ্যানে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যায় র‍্যাবকেও ছাড়িয়ে গেছে পুলিশ। গত জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছেন ৮৯ জন। এর মধ্যে জানুয়ারী মাসে ৩৯ জন, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬ জন, মার্চ মাসে ১৬ জন এবং এপ্রিল মাসে ১৮ জন।

সুধী পাঠক! মানবাধিকার সংগঠন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, অধিকার এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত উক্ত খবরে দেখা যাচ্ছে, এই চার মাসে নিহতদের মধ্যে পুলিশের হাতে মারা গেছেন ৪৯ জন, র‍্যাবের হাতে ১৫ জন, যৌথ বাহিনীর হাতে ২১ জন, র‍্যাব ও বিজিবির হাতে ২ জন ও কোস্টগার্ডের হাতে ৩ জন। এর মধ্যে জামায়াতের ১৪ জন, বিএনপির ১২ জন, ছাত্র শিবিরের ৭ জন, যুবদলের ৮ জন, ছাত্রদলের ৮ জন, জেএমবির ১ জন এবং কথিত সন্ত্রাসী ৪১ জন। এসব হত্যাকাণ্ডের এলাকা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে সাতক্ষীরায় ৯ জন, কক্সবাজারে ৮ জন, চট্টগ্রামে ৫ জন, চাঁদপুরে ২ জন, খুলনায় ৩ জন, দিনাজপুরে ৩ জন, নীলফামারীতে ৪ জন, ফেনীতে ৪ জন, রংপুরে ৫ জন, যশোরে ৫ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ৪ জন, গাইবান্ধায় ২ জন, বাগেরহাটে ৬ জন এবং অন্যান্য কয়েকটি যেলাতে ১ জন করে মোট ৬১ জন নিহত হন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ১১১ জন গুমের তথ্য পেয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৫১ জন, গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে ৩৬ জন, পুলিশের হাতে ৫ জন, র‍্যাব ও পুলিশের হাতে ২ জন, শিল্প পুলিশের হাতে ১ জন এবং অন্যান্যভাবে ১৬ জন। শুধুমাত্র ২০১৩ সালে ৩৫ জন গুমের তথ্য পাওয়া গেছে। মৃতদেহ পাওয়া গেছে ২ জনের, জীবিত ফেরত এসেছে ১৬ জন এবং এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ১৭ জন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ৩ মাসে ৩৯টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বিএনপির ১১ জন, ছাত্রদলের ৩ জন, জামায়াত-শিবিরের ২ জন, ছাত্রলীগের ৪ জন, ব্যবসায়ী ৩ জন, চাকুরিজীবী ৪ জন এবং সাধারণ নাগরিক ১১ জন। এই ৩৯ জনের মধ্যে ১২ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ২৩ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছে *(দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২২ মে'১৪, পৃঃ ১-২)*।

র‍্যাবের হিসাব মতে, গত ১০ বছরে র‍্যাব ১২০০ জন অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে। ভুয়া র‍্যাব পরিচয়দানকারী ৫ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ২৬৪১টি অপহরণ ও গুমের অভিযোগ তদন্ত করে এর মধ্যে ৪০ শতাংশই ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে *(দৈনিক যুগান্তর-০৪ মে'১৪, পৃঃ ৫)*।

**গুম-খুন-অপহরণের কারণ সমূহ :**

দেশে চলমান গুম-খুন-অপহরণের ঘটনা সাধারণ জনগণকে খুব আতংকিত করে তুলেছে। তাই বলা যায় বাড়ির ভিতরে হচ্ছে খুন এবং বাইরে হচ্ছে অপহরণ ও গুম। কোথাও কোন নিরাপত্তা নেই। পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করা হল।

**নৈতিক অবক্ষয় :**

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মানুষ তার নীতি বা মনুষ্যত্বকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছে যে, সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। চার বছরের শিশু ধর্ষিতা হচ্ছে; এমনকি ভাই আপন বোনকে, পিতা আপন মেয়েকে অন্যের কাছে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করছে না। আবার ধর্ষণের খবর রেকর্ড করে মিডিয়ায় প্রকাশের ভয় দেখানো হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রচারিতও হচ্ছে। যার প্রমাণ সম্প্রতি ঢাকায় পুলিশ দম্পতি নিজ মেয়ে ঐশী দ্বারা নিহত হওয়া এবং টাকার লোভে আপন ভাই তার শিশু ভাইকে অপহরণ ও হত্যা করা।

**প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা :**

বর্তমানে দেশে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার রাজনীতি চলছে। এজন্য কেউ গুম-খুন-অপহরণ করতে দ্বিধা করছে না। সম্প্রতি ঢাকায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় চার জন নিহত হওয়া এবং যুবলীগের এক থানার সেক্রেটারী তারেক সিদ্দীকি কর্তৃক অপর থানার সেক্রেটারী মিল্কীকে গুলি করে হত্যা করা এবং তা মার্কেটের সিসি ক্যামেরায় ছবি দেখে খুনিকে চিহ্নিত করা হয়। গত ২০ মে ২০১৪ ফেনীর ফুলগাজী উপযেলা চেয়ারম্যান একরামকে প্রকাশ্যে গুলি ও কোপানোর পর পেট্রোল ঢেলে গাড়ির ভিতরেই পুড়িয়ে অঙ্গার করে সন্ত্রাসীরা *(দৈনিক বর্তমান ২১ মে'১৪, পৃঃ ১)*। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও মিডিয়া জানিয়েছে, ফেনীর সরকারদলীয় দুই হাজারীর দ্বন্দ্বের বলি একরাম! তবে অনেকে জানিয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এমন লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছেন *(দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২২ মে'১৪, পৃঃ ১)*। হরতালে নির্দলীয় চায়ের দোকানদার বিশ্বজিৎ দাশকে বিরোধী দলের কর্মী মনে করে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা দিনে-দুপুরে পিটিয়ে হত্যা করে। যে চিত্র সাধারণ মানুষ মিডিয়ায় দেখে আঁতকে উঠে।

**রাজনৈতিক কারণে :**

এ কারণটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা, জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা, সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া হত্যা, রাজনীতিবিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা, ২১ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আইভি রহমানসহ ২২ জনকে হত্যা করা প্রভৃতি হত্যাকাণ্ডগুলো রাজনৈতিক কারণে ঘটেছিল। এছাড়া বর্তমানে যেসব হত্যাকাণ্ড, গুম ও অপহরণ চলছে তার অধিকাংশই রাজনৈতিক কারণেই হচ্ছে।

**অর্থনৈতিক কারণে :**

বর্তমানে যেসব অপহরণ হচ্ছে তার অধিকাংশই অর্থনৈতিক কারণে। টাকা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে টাকার লোভে ভাই ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করতে কুণ্ঠিতবোধ করছে না। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে যে ৭ খুন তার পিছনে নাকি ৬ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে প্রকাশিত মিডিয়ার খবরে জানা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে বগুড়ায় রহমাননগর এলাকায় একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক নিহত হওয়ার পিছনে নাকি তার নিজের মামীর হাত আছে বলে খবরে প্রকাশ পায়; কারণ কোচিং সেন্টার পরিচালনা এবং টাকার ভাগ নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। প্রায় প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে অপহরণ করার পরই মোটা অংকের অর্থ বা টাকা দাবী করা হচ্ছে। এছাড়া জমিজমা সংক্রান্ত জেরেও এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে। সারাবিশ্বে সবচেয়ে লোমহর্ষক, আলোচিত ও বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেওয়ার মত ঘটনা রানা প্লাজা ধ্বসে সাড়ে ১১'শর মত শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য । কারণ ঝুঁকিপূর্ণ একটি ভবন জানার পরও শ্রমিকদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়া।

**ব্যক্তিগত বিরোধ :**

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, ক্ষমতায় টিকে থাকার বিরোধ, নারী বা প্রেমঘটিত প্রভৃতি বিরোধগুলো সাধারণত ব্যক্তিগত বিরোধেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এ কারণেই দেশের মধ্যে এরকম লোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে অহরহ।

**রক্ষক যখন ভক্ষক :**

কথায় আছে, যে সরিষা দিয়ে ভূত তাড়াবে সেই সরিষাই ভূত থাকে আর রক্ষক যখন ভক্ষক হয় তখন সমাজ ও দেশের জনগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাবে এবং সর্বত্র গুম-খুন-অপহরণ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। নারায়ণগঞ্জের ৭ খুনের ঘটনায় র‍্যাব কর্মকর্তা জড়িত হওয়ার ঘটনা তার প্রমাণ। তাছাড়া সম্প্রতি দেশে যেসব গুম এবং অপহরণ চলছে প্রায় প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার সময় অপহরণকারীরা নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক বলে পরিচয় দিচ্ছে।

কারণ সাদা পোশাকে বিনা ওয়ারেন্টে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পর ডজন-ডজন মামলা দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে নাজেহাল ও হেনস্থা করার ঘটনা ঘটছে। দেশে সম্প্রতি সোনা চোরা-চালান বৃদ্ধি পেয়েছে, কেজি-কেজি স্বর্ণের চালান ধরা পড়ছে এবং বিদেশ থেকে বিশেষ করে ভারত থেকে নিত্য ব্যবহার্য হাযারও রকমের জিনিস প্রশাসনের সামনে দিয়ে দেশে আনা হচ্ছে। যে কারণে নিত্য-ব্যবহার্য দেশীয় জিনিসের চেয়ে বিদেশী বা ভারতীয় জিনিসে বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে। যেগুলো প্রশাসনের দায়িত্বশীলগণ দেখেও না দেখার ভান করছে অথবা ঘুষ নিয়ে এসব ঘটনা ঘটানোর অনুমোদন দিচ্ছে।

**ধর্মীয় অসচেতনতা :**

দেশে বিরাজমান অনৈসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি এবং ধর্মীয় অসচেতনতা বিরাজমান গুম-খুন-অপহরণের জন্য মৌলিক দায়ী। কারণ মানুষের মধ্যে যেমন অনৈতিকতার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পরকালের হিসাব বা মৃত্যুর পর বিচার দিবস সম্পর্কে না জানা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলছে এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড।

আল্লাহ বলেন, مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا 'কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন' *(নিসা ৪/৮৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا- بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا- يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সেটাও দেখবে' *(যিলযাল ৯৯/৪-৮)*।

**আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবণতি :**

দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যখন চরম অবনতি ঘটে তখন এসব লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। আজ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেন হারিয়ে গেছে। কারণ তারা ঘুষ কিংবা উপরের চাপে দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আসল অপরাধীকে না ধরে কিংবা মুক্তি দিয়ে নকল কিংবা অপরাধী নয় এমন ব্যক্তিকে দিয়ে মামলা সাজাচ্ছে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা কে না জানে? যেখানে ৫৭ জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। সারাদেশে একযোগে ২০০৫ সালের ১৭ আগষ্ট বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সারাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাদের হাতে এর কোন খবরই থাকে না। ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আওয়ামীলীগের তৎকালীন নেত্রী আইভী রহমানসহ ২২ নেতাকর্মীকে হত্যা করে; অথচ প্রশাসন তার খবরই রাখে না। এর পরেও আমাদের দেশের মন্ত্রীরা বলেন, দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ধিক! ঐ আইন শৃঙ্খলার যেখানে মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই।

**নেতৃত্বের লোভ :**

দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হল নেতৃত্বের প্রতি লোভ। সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নেতা হওয়ার প্রতি। আর এ নেতা হওয়ার জন্য এমন কোন ঘৃণ্য ঘটনা নেই যা তারা ঘটাচ্ছে না। প্রতিদিনই মিডিয়ার প্রতি তাকালে দেখা যাচ্ছে দেশের কোথাও না কোথাও এমপি, মন্ত্রী, মেম্বার, চেয়ারম্যান কিংবা মেয়রদের মধ্যে দ্বন্দ লেগেই আছে। এতে আহত-নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। প্রতিপক্ষকে দমন করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের অগ্রাধিকার থাকা চাই। এর জন্য যত অন্যায় করার প্রয়োজন হোক কিংবা মিডিয়ায় শিরোনাম হওয়া প্রয়োজন হোক সবই করছে। নিজের অনুগত লোকদের দ্বারা গুম-খুন-অপহরণ করাচ্ছে সর্বদা।

**আইনের অপশাসন :**

আইনের অপশাসন বলতে সঠিক ও সময়মত বিচার ব্যবস্থা না থাকা ও না হওয়া। দেশের প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোঁকরে প্রকৃত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে; আবার আইনের লোকদের হাত করে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীরা থাকছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসহায়-নিরীহ জনসাধারণ। আবার মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ন্যায়বিচারকে ব্যহত করছে। এমনও দেখা গেছে একটি মামলা যুগ-যুগ ধরে চলছে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে মামলা করতে দিচ্ছে না।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় মামলার জট ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, ফৌজদারী আদালতে প্রায় ২০ লাখের মত মামলা জমে আছে। কোন কোন মামলা নিষ্পত্তি হতে ৫-১০ বছর পর্যন্ত লাগছে। ফলে বিচার প্রার্থীদের টাকা ও সময় দু'টিই অধিক ব্যয় হচ্ছে *(প্রথম আলো, ১৭ মার্চ'১৪, পৃঃ ৪)*। অপর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১লা জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত দেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৯ লাখ ৪২ হাযার ১৮৩টি। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগে ৯,১৪১টি, হাইকোর্টে ৩,১৩,৭৩৫টি, যেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য ট্রাইব্যুনালে ৮,৪৮,৪৪২টি এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৭,৭০,৮৬৫টি। বলা হয়েছে নতুন মামলা না হলে এগুলো শেষ হতে ৪-৬ বছর সময় লাগবে *(মাসিক আত-তাহরীক, ১৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে/২০১৪, পৃঃ ১০)*।

সুধী পাঠক! আইনের অনুশাসন না থাকাতে সঠিক বিচার ব্যবস্থা আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। তাইতো এমনিতর হাযার হাযার অসহায় মানুষগুলো বিচারের ঘানি টানছে। যা আইনী জটিলতা এবং মামলা মুকাদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতার অসহায় শিকার!

**নষ্ট মিডিয়া ও সংস্কৃতি :**

নষ্ট মিডিয়াগুলো সংস্কৃতির নামে যুবসমাজের চরিত্র নষ্ট করছে। অন্যায়-অশ্লীলতার যাবতীয় প্রক্রিয়া এসব মিডিয়ায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে হায়েনারা গুম-খুন-অপহরণের মত ঘটনা ঘটাচ্ছে। এসব ঘটনা ঘটানোর পিছনে পরোক্ষভাবে নষ্ট মিডিয়া ও সংস্কৃতিও দায়ী।

**রাষ্ট্রকে অকার্যকর করার চক্রান্ত :**

দেশ-বিদেশে অনেকেই নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে অকার্যকর করতে সর্বদা তৎপর থাকে। সরকার বা প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলার জন্য গুম-খুন-অপহরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

আবার অনেক বিরোধী দল আছে যারা সরকারকে উৎখাত কিংবা বেকায়দায় ফেলার জন্যও এসব ঘটিয়ে ঘটিয়ে থাকে।

**নেশা :**

নেশা মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। আজকে নেশা দিয়ে জাতিকে বিশেষ করে যুবসমাজকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রায় প্রতিটি কোল্ড ড্রিংকস্‌ের সাথে নেশা জাতীয় দ্রব্য মেশানো থাকে। আর এসব কোল্ড ড্রিংকস্ সারা দেশে ঠাণ্ডা পানীয়ের নামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মদ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। এসব নেশার অর্থ চাহিদা পূরণ করতে কিংবা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়ে গুম-খুন-অপহরণের মত লোমহর্ষক ঘটনা আজ নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**নারী বা প্রেমঘটিত :**

বর্তমানে যেসব গুম-খুন-অপহরণ হচ্ছে তার অধিকাংশের সাথে নারী বা প্রেমঘটিত কারণ বিদ্যমান। মেয়েদের রূপের মোহে পড়ে অনেক যুবক তাদের প্রেমে পড়ছে। প্রস্তাবে রাজী না হলে তারা তাদেরকে গুম-খুন-অপহরণ করতে দ্বিধা করছে না। অনেক মহিলা প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইল করে নিজের ভালবাসার মানুষ এমনকি স্বামীকে পর্যন্ত অপহরণ বা গুম-খুন করছে। ছলনাময়ী নারীরা প্রেমের অভিনয় করে কিছু অর্থ হাতিয়ে নেয় আর এতে কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে গুম-খুন-অপহরণ করা হচ্ছে। আবার অনেক মেয়ে নষ্ট যুবকের পাল্লায় পড়ে নিজের সর্বস্ব হারাচ্ছে; এমনকি অনেককে গুম-খুন-অপহরণ পর্যন্ত করা হচ্ছে।

গুম-খুন-অপহরণের জন্য উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- গডফাদার, অতি উৎসাহী, উচ্চ আকাঙ্খা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি।

**ইসলামী দৃষ্টিকোণ :**

ইসলাম নিরপরাধ মানুষের হত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে। পৃথিবীতে যত রকমের গোনাহের কাজ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করা। এরপর সবচেয়ে বড় গোনাহ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। কুরআন ও হাদীছে অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ হরণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

‘আপনি বলুন, এসো! তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন তা তেলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে। আর দারিদ্রের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমি তোমাদের রিযিক দেয় এবং তাদেরও। আর অশ্লীল কাজে নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ‘তোমরা সেই জীবকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; তবে সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. ‘আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া’ *(বুখারী হা/৬৮৭১)*।

একজন নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে কুরআনে পুরা মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

‘এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের উপর এ হুকুম দিলাম, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানষকে হত্যা করলো। আর যে তাঁকে বাঁচালো সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলো নিয়ে এসছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী’ *(মায়েদা ৫/৩২)*।

ডাকাতি ও সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি’ *(মায়েদার ৫/৩৮)*।

পরিশেষে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ নযর প্রদান ও পদক্ষেপ গ্রহণই একমাত্র এ মহামারীর হাত থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়। আল্লাহ আমাদের দেশের নেতাদের সুমতি প্রদান করুন! জনসাধারণকে নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করুন এবং এ মহামারী থেকে রক্ষা করুন-আমীন!!

***[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহদীছ যুবসংঘ, জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা]***

# দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

## আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

## دور الجديد : المرحلة الثانية (الف)

### জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

### حركة الجهاد للشهيدين

### (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

মৌলবী কারামত আলী জৌনপুরীকে সাইয়েদ আহমাদ জৌনপুরী এলাকায় তাবলীগের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[১২৭] পরতীতে তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে চলে আসেন ও জিহাদ বিরোধী মত প্রকাশ করতে থাকেন। এক সময়ে তিনি ইংরেজদের পক্ষে ফৎওয়া দিয়ে বলেন যে, 'এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই; বরং ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা উচিত'। ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলিকাতা মোহামেডান ল' সোসাইটিতে বৃটিশ ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, '২য় প্রশ্ন হচ্ছে, 'এদেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত কি-না' প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমাধান হ'য়ে গেছে। কারণ দারুল ইসলামে জিহাদ কখনো আইনসংগত হ'তে পারে না। এটা এত স্পষ্ট যে, এর সমর্থনে কোন যুক্তি-প্রমাণ বা প্রামাণ্য দলীল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত তবে। আর মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধি করা হয়েছে। সুতরাং একই কারণে অনুরূপ যুদ্ধ বেআইনী হবে। অতএব কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে, তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফৎওয়ায়ে আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে'।[১২৮]

উইলিয়াম উইলসন হান্টার (W.W. Hunret) তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে কারামত আলীর উক্ত বক্তৃতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে সংখ্যাগুরু সুন্নী মাযহাবের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় মাওলানা জৌনপুরীর সমর্থনে প্রচারিত ফৎওয়াসমূহের সারাংশ 'কলিকাতা মোহামেডান ল সোসাইটি অধিবেশনের সারাংশ, ২৩শে নভেম্বর ১৮৭০' এই শিরোনামে প্রকাশিত পুস্তিকাটি পড়ে দেখার জন্য সকল মুসলমানকে অনুরোধ করেছেন। শেষের দিকে খুশীতে গদগদ হ'য়ে তিনি বলে ফেলেছেন, 'এতে করে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমান ব্যবহার করা যায়'। এই সময়ে শী'আ নেতারাও একইভাবে জিহাদবিরোধী ফৎওয়া প্রচার করেন।[১২৯]

শুধু হান্টার নন ভারতের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে অন্যতম বিজ্ঞ ইংরেজ প্রতিবেদক জেম্‌স উকেনলি (James Ookenly) কারামত আলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'তিনি বৃটিশ সরকারের সাহায্যকারী এবং ওয়াহ্হাবীদের কট্টর বিরোধী ছিলেন'। মাসঊদ আলম নদভী (১৯১০-৫৪ খৃঃ) বলেন, 'আক্বীদা ও আমলের দিক হ'তে তিনি সাইয়িদ আহমাদের প্রধান সহযোগীদের থেকে একেবারেই পৃথক ছিলেন'।[১৩০] আবুল হাসান নদভী বলেন, 'সাইয়িদ ছাহেবের সাধারণ সাথীদের থেকে তাঁর রংয়ে (চালচলনে) কিছুটা পার্থক্য ছিল'।[১৩১]

অতঃপর মাওলানা আবদুল হাই (মৃত ১২৪৩/১৮২৮) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়।[১৩২] তিনি কোন গ্রুপের নেতৃত্ব দেননি। বরং এক হিসাবে বলা চলে তিনি সক্রিয় জিহাদেই অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। প্রথম জীবনে তিনি মীরাটের ইংরেজ আদালতের মুফতী ছিলেন। পরে সাইয়িদ আহমাদের নিকটে বায়'আত করেন। তিনিই প্রথম বায়'আত নিয়ে পরে আল্লামা ইসমাঈলকে সৈয়দ আহমাদের নিকটে নিয়ে যান। মাওলানা আবদুল হাই শাহ আবদুল আযীযের জামাতা ছিলেন। তিনি সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে হজ্জের সফরে গিয়ে ইয়ামানে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫)-এর নিকট হতে হাদীছের সনদ লাভ করেন। শাওকানীর 'মউযূ'আত' তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে শাহ ইসমাঈলের ন্যায় তিনিও সোচ্চার ছিলেন। হানাফী ফিকহে খুবই পারদর্শী ছিলেন। হজ্জের সফরে তিনি 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর আরবী অনুবাদ করেন।[১৩৩]

তিনি স্বল্পভাষী, লজ্জাশীল ও শান্ত মেযাজের মানুষ ছিলেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমাদের সঙ্গে রায়বেরেলী হ'তে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে টোংকের ট্রেনিং কেন্দ্রের প্রশিক্ষক হিসাবে তাঁকে পাঁচমাস অবস্থান করতে হয়। এরপর সৈয়দ আহমাদের চিঠি পেয়ে তিনি সীমান্ত রওয়ানা হন এবং ১২৪১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষদিক মোতাবেক ১৮২৭ সালের মে মাসের শেষদিকে তিনি সীমান্তের পাঞ্জতার ঘাঁটিতে পৌঁছেন। কয়েকমাস ব্যাপী সফরের কষ্ট, রোগজীর্ণ শরীর ও বার্ধক্যভাবে অবনমিত দেহ নিয়ে তিনি ঘাঁটিতে পৌঁছলেন বটে; কিন্তু পুরাতন অর্শরোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ৮ই শা'বান ১২৪৩ হিজরী মোতাবেক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ দিবাগত রাতে তিনি ঘাঁটিতেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইসমাঈল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁর মরদেহ গোসল করান ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন।[১৩৪]

শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাইয়ের উক্ত জীবনী সামনে রাখলে ইংরেজ প্রতিবেদকের রিপোর্ট একটি নিছক কল্পনা বলেই মনে হয়। প্রকৃত অর্থে মুজাহিদগণের মধ্যে গ্রুপিং ও দলাদলি ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন জিহাদ ও শাহাদতের জন্য পাগল, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল নিঃস্বার্থ মুত্তাক্বী মুসলমান। তবে একথা সত্য যে, শহীদায়েনের শিক্ষার বদৌলতে মুজাহিদগণের মধ্যে তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁরা কুরআন ও হাদীছের নির্দেশকে অন্য সবকিছুর উপরে স্থান দিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর একারণেই জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনও ছড়িয়ে বালাকোটের পরে জিহাদের নেতৃত্ব পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে আসে, যাঁরা আহলেহাদীছ ছিলেন। আমীর বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর ইন্তেকালের পর তাঁদের অনুসারী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শতাধিক বর্ষব্যাপী জিহাদ চালু থাকে। মাওলানা আব্দুস সামী'

১২৭. মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন, পৃঃ ২৮৬।
১২৮. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৫৮; গৃহীত : মুযাকারায়ে ইলমিয়াহ (নওকিশোর ছাপা, লাক্ষ্ণৌ ১৮৭০ সাল), পৃঃ ৯; হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, অনুবাদ : আনিসুজ্জামান, পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।
১২৯. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, অনুবাদ : আনিসুজ্জামান (ঢাকা : খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৮২), পৃঃ ৯৯-১০৪।
১৩০. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৫৮।
১৩১. আবুল হাসান আলী নাদভী, সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, পৃঃ ৪৫৫।
১৩২. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩২ গৃহীত : মুসলমানুঁ কা রওশন মুস্তাক্বাল, পৃঃ ১০৪।
১৩৩. আলী নাদভী, সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ, পৃঃ ৩৭১।
১৩৪. মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন, পৃঃ ১০৯-১১৬।

আজও 'আমীরুল মুজাহেদীন' হিসাবে পাটনার 'দারুল ইমারত' সামনে আছেন।[১৩৫] পাকিস্তানের পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে মুজাহিদ নেতা মাওলানা জামীলুর রহমানের নেতৃত্বে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ আজও রাশিয়ান ও আফগান সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত আছেন।[১৩৬] আফগানিস্তানের স্বশাসিত 'নূরিস্তান' এলাকা আহলেহাদীছদের স্বাধীন রাজনৈতিক পরিচয় ঘোষণা করছে।[১৩৭] মাসঊদ আলম নাদভীর হিসাব মতে, কেবল ১৮৩১ হ'তে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নয়, বরং আজও পর্যন্ত আহলেহাদীছগণ ভারত উপমহাদেশের সকল প্রান্তের শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে যেমন আপোষহীন জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, কথা কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিদ'আতপন্থী ও স্বার্থপর আলিমদের বিরোধিতার সম্মুখীন যেমন ইতিপূর্বে ইসমাঈল শহীদকে হ'তে হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি আজও ঐসব আলিমদের ও তাদের সহযোগীদের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতার মুকাবিলা করতে হচ্ছে। ইংরেজ আমলের ন্যায় আজও আহলেহাদীছগণকে 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম করা হয়ে থাকে।[১৩৮]

বালাকোট ও পরবর্তী আন্দোলন মূলতঃ আহলেহাদীছদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে এবং 'ওয়াহ্হাবী' ও 'আহলেহাদীছ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী (মৃত ১৩৩৮/১৯২০) নিজের প্রচেষ্টায় ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয় সেকথা বৃটিশ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি সাধারণ নিরীহ আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজের জেল-যুলম হ'তে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত আহলেহাদীছকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার যে ব্যর্থ চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে লক্ষ্য করা গেলেও, তা কোনক্রমেই ঠিক নয়। মাওলানা বাটালভী ব্যতীত সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের কোন উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীছ আলেম উক্ত ভূমিকা সমর্থন করেননি। গযনভীর লাক্ষাবী ছাদিকপুরী, রহীমাবাদী ক্বাছূরী পরিবারের কোন আলেম বা বাংলাদেশী কোন মুজাহিদ ও নেতা কখনই মাওলানা বাটালভীর উক্ত আপোসমুখী ভূমিকা সমর্থন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আব্দুল মওদূদ বলেন, 'কালক্রমে বাঙালী জিহাদীরা আহলেহাদীছ, লা-মাযহাবী, মাওয়াহেদ, মুহাম্মাদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ...শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ লড়তে বাঙালী মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অগণিত অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছে। সেকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে তাদের অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নযর এড়িয়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যুদ্ধের এ দু'টি অতি প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহকারীদের মধ্যে মালদহের রাফিক মির্যা ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের নাম ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে।[১৩৯]

তিনি আরও বলেন 'সমুদ্যত অস্ত্র ও আইনের শৃংখল পর্যন্ত না হওয়ার দেশপ্রসিদ্ধ আলেমদের, এমনটি মক্কা শরীফের চার মাযহাবের প্রদান মুফতীদের ফতোয়া প্রচারেরও দরকার হয়েছিল ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবার জন্য। বিদেশী ও বিধর্মদের মাসনাধিকারে চলে গেলেও এদেশটাকে 'দারুল ইসলাম' হিসাবে মেনে নিয়ে এখানে শান্তিতে ও নিরূপদ্রবে বসবাস করতে ধর্মীয় অনুমোদনও এসব ফতোয়ার দ্বারা লাভ করা হয়েছিল।[১৪০]

তিনি বলেন, 'এ জিহাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের বিভিন্ন অংশের উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মুসলমান এবং একে সংগঠন ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এযুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ'।[১৪১]

বর্ণিত সেই আলেম সমাজ ছিলেন বাংলা, বিহার ও সীমান্তে যুদ্ধের ময়দানে বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাঁদের অনুসারী অধিকাংশ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। খানক্বাহ, দরগাহ ও আস্তানার নিরূপদ্রব কক্ষগুলির আরাম-আয়েশ যাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। তীজাঁ, দাসওয়াঁ, কুলখানি চেহলাম, ওরস ও সীমা, মীলাদ, ইছালে ছওয়াব ও শবেবরাতের আলোকসজ্জা ও হালুয়া-রুটির লোভনীয় আকর্ষণ যাদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সবকিছুর উর্ধ্বে ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগ এবং লোক ও রসদ প্রেরণের সাথে সাথে অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ সিংহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাযার হাযার মাইল দূরে সীমান্তের পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্কা, আসমাস্ত ও চামারকান্দের মুজাহিদ ও শাহাদাতের অমিয়সুধা পানের উদগ্র বাসনা নিয়ে। আল্লামা ইসমাঈল, মাওলানা বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সে যুগেও যেমন একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের নিকট ধিকৃত ছিলেন। এযুগের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও তেমনি একশ্রেণীর ওলামার নিকটে ধিকৃত হয়েই আছেন।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উপরে গবেষক ডঃ কেয়ামুদ্দীন আহমাদ বলেন, 'একদিকে সীমান্ত এলাকা, অন্যদিকে বিহার ও বাংলা এলাকা-এ দু'টি ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু (Two pivots), যাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে'।[১৪২] সীমান্ত ছিল যুদ্ধস্থল কিন্তু বিহার (পাটনা) ও বাংলা এলাকা ছিল মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণের কেন্দ্রস্থল, যা হ'ল জিহাদের মূল হাতিয়ার। বর্তমানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সীমান্ত এলাকা পাকিস্তান ও আফগনিস্তানে, সমগ্র বিহার ও বাংলা এলাকার পশ্চিমাংশ ভারতে এবং বাংলার পূর্বাংশ স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত অন্যান্য সকল অঞ্চলে আহলেহাদীছ-এর বসবাস থাকলেও বালাকোট পরবর্তী শতবর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এলাকা হওয়ার কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা উপমহাদেশের অন্য সকল এলাকার তুলনায় আজও বেশী। এটা যে জিহাদ আন্দোলনেরই বাস্তব ফল, তা বলা যেতে পারে।

***[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৭২-২৭৭]***

---

১৩৫. আবদুস সামী বিন আবদুল খবীর বিন আবদুল হাকীম বিন আহমাদুল্লাহ (জন্ম ১২২৩/১৮০৮ খৃঃ), আন্দামানের ১ম মুজাহিদ কয়েদী ও ২য় শহীদ, ১২৯৮ হিঃ মোতাবেক ২২শে নভেম্বর ১৮৮১) ইবনে ইলাহী বখ্শ মুনীরী অতঃপর ছাদেকপুরী (রহঃ)। -কাইয়ূম খিযির, ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযীদায়ে ওয়াতন (পাটনা : বিহার লিথো প্রেস, ১৯৭৯), পৃঃ ৩৫-৩৬; আবদুর রহীম ছাদেকপুরী (১৮৩৬-১৯২৩), তাযকেরায়ে ছাদেকাহ (পাটনা : মাতবা'আ ওছমানী ১৩১৯/১৯০১), পৃঃ ৪১-৪৩। ঠিকানা : ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদিকপুর, পাটনা-৭, বিহার, ভারত।

১৩৬. আফগানিস্তান হ'তে রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার করার পর কুনাঢ় প্রদেশ মুক্ত হওয়ার সাথে মাথে সেখানে সকল আফগান মুজাহিদ গ্রুপের নির্বাচনে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণের নেতা শায়খ মাওলানা জামীলুর রহমান প্রথম স্বাধীন কুনাঢ় ইসলামী হুকুমতের 'আমীর' নির্বাচিত হন। কিন্তু প্রায় দেড় বছর পরে 'হিযবে ইসলামী' হিকমতিয়ার গ্রুপের নেতৃত্বে বাকী ৭টি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হয়ে গত ২২শে আগষ্ট '৯১ ভোর রাতে অতর্কিতে 'দারুল ইমারত আস'আদাবাদে' হামলা ও বহু লোককে হতাতহ করে। অতঃপর ৩০শে আগষ্ট '১৯ 'বজোর' নামক স্থানে আমীর মাওলানা জামীলুর রহমান আততায়ীর হস্তে শহীদ হন -লাহোর : সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, ৪৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ১৫ নভেম্বর ১৯৯১।

১৩৭. আফগানিস্তানে পূর্বপ্রান্তে অবিস্থত কুনাঢ় ও লাগমান প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে প্রায় ১২ হাযার বর্গমাইল আয়তন ও দেড় লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে এই এলাকা গঠিত। এখানকার মুসলমানেরা নিজেদেরকে 'কুরায়েশ' বংশীয় বলে দাবী করেন। প্রায় সকলেই আহলেহদীছ। আমীর মাওলানা আফযাল-এর নেতৃত্বে এখানে ১৯৭৮ সাল হ'তে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত চালু আছে। আবদুল রহমান কীলানী, 'সারগুযাস্তে নূরিস্তান' (লাহোর : সেভেন ব্রাদার্স প্রেস, ১৯৮৬), পৃঃ ৩৭-৪১।

১৩৮. H.A.R Gibb & Others, ENCYCLOPEDIA OF ISLAM (London : Leiden, Brill 1960) VOL. 1. P. 259.

১৩৯. আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ১০০।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

১৪২. Qeyamuddin Ahmed, THE WAHABI MOVEMENT (Calcutta : Firma K. L. Mukhapadhya, Ist Ed.) P. 225-26.

# আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

## পাবনার অভিভাষণ

*[১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পাবনা যেলা আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]*

**(২য় কিস্তি)**

উল্লিখিত উক্তি সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আহলেহাদীছগণের মাযহাব হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব হইতে স্বতন্ত্র।

এযাবৎ আহলেহাদীছগণের দলগত পরিচয় সম্পর্কে যতগুলি কথা আমি আলোচনা করিয়াছি, তদ্বারা কয়েকটি বিষয় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন :

প্রথমতঃ আহলেহাদীছগণ কোন নতুন দল নহেন বা শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ খ্রিঃ) অথবা অন্য কোন আধুনিক ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং রাসূলে কারীম মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ)। মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের বহু পূর্ব হইতে এই দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। যাহারা আহলেহাদীছগণকে দুই এক শতাব্দীর নতুন দলরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইতিহাস, মিলল ও ফিক্বহগ্রন্থ সম্পর্কে স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ 'আহলেহাদীছগণ' প্রচলিত মাযহাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত হাদীছসমূহের বিশারদগণের নাম নহে। আহলেহাদীছগণের পরিগৃহীত মাসআলা গুলির প্রায় সমস্তই মাযহাব চতুষ্টয়ের অন্তর্গত কোন না কোন দল কর্তৃক নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু আহলেহাদীছগণ প্রচলিত মাযহাবসমূহের মধ্যে নির্দিষ্টরূপে কোন একটির অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদের দল সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

তৃতীয়তঃ কেবল শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণ আহলেহাদীছরূপে পরিচিত ছিলেন না; ছাহাবীগণের যুগে সকল মুসলিম এবং পরবর্তীকালে সাধারণ মুসলিমগণের একটি দল এই নামে পরিচিত ছিলেন

ভ্রাতৃগণ! অতঃপর আমি **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর কয়েকটি মূলনীতির কথা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট আলোচনা করিব।

প্রথম : মুসলিমগণের অনুসরণীয় ইমাম ও নেতা একমাত্র রাসূলে কারীম মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ); অপর কোন ব্যক্তি নহেন- হইতেও পারেন না।

দ্বিতীয় : মুসলিমদিগকে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুসারে করিতে হইবে।

তৃতীয় : কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিতর কোন সমস্যার সমাধান দৃষ্টিগোচর না হইলে তৎসম্পর্কে ছাহাবীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থ : যেসকল বিষয়ের মীমাংসা কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবীগণের ইজমার মধ্যে নাই, সেই সকল বিষয়ের কিতাব ও সুন্নাতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আলেমগণ ইজতিহাদ করিবেন। কিতাব ও সুন্নাতের প্রতিকূল কোন ইজতিহাদ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোন ইজতিহাদ কিতাব ও সুন্নাত এবং ছাহাবীগণের ইজমার স্থান অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

পঞ্চম : কোন ক্রমেই ধর্মীয় ব্যাপারে কাহারো বেদলীল উক্তির অনুসরণ তথা তাক্বলীদ করা চলিবে না।

**আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর এই মূলনীতিগুলি ছাহাবী ও তাবেঈনের পরিগৃহীত মূলনীতির সারাংশ মাত্র।

ভ্রাতৃগণ! কেন্দ্র ছাড়া যেরূপ বৃত্তের কল্পনা করা সম্ভবপর নয়, আকাশ ও পৃথিবী বিরাট গোলকের শৃংখলাকেও সেইরূপ কেন্দ্রীভুত করা হইয়াছে। শিক্ষিত মুসলিম সাধকবৃন্দ বলিয়া থাকেন, الحقيقة كالكرة। 'হাক্বীক্বাত বা বাস্তব প্রকৃতপক্ষে বৃত্তের ন্যায়'। মানবীয় আক্বায়েদ (মতবাদ) ও আমলের (আচরণ) কেন্দ্র আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নাই, হইতে পারে না। এই মূল কেন্দ্র কোন কারণে এবং কোন অবস্থাতেই আপন স্থান হইতে সরিবে না, সকলকেই এই মূল কেন্দ্রের নিমিত্ত আপনাপন কেন্দ্রাতিক (Centrifugal) স্থান ইহতে সরিয়া আসিতে হইবে। এই আশ্রয় ও অবলম্বন কাহারো খাতিরে, কাহারো ভয়ে, কাহারো ভক্তির জন্য কোন কেন্দ্রাতিগাকর্ষণের নিমিত্ত পরিহার করা যাইতে পারে না; সকল দুয়ার, সকল আশ্রয় ও সকল আকর্ষণকে এই মহান অবলম্বন লাভ করিবার জন্য ছিন্ন করিতে হইবে।

আহলেহাদীছ পথ উল্লিখিত কেন্দ্রশক্তির প্রেরণা মাত্র। এই পথ ইহতে বিচ্যুত হওয়ার দরুন কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুসলিমগণ কেন্দ্রচ্যুত জীবন-যাপন করিতেছেন।

কেউ কেউ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, দলপন্থী সকল মুসলিম মূলতঃ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন। তবে এই কার্য তাঁহারা স্ব স্ব অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যস্থতায় সমাধা করিতে চাহেন মাত্র। এই কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অজ্ঞ ও কলহপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া কেউই অস্বীকার করিতে পারে না! জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, এরূপ আচরণের সাহায্যে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা সুন্নাতের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কী? না তাহা কতকগুলি সাধারণ ব্যক্তিত্বের অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া যায়? ইমাম ও মুজতাহিদগণ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করিবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন বলিয়াই কী আল্লাহ তদীয় রাসূলের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে? এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত আদেশের অধিকার কাহার হস্তে সমর্পণ করা হইল? যে সকল মানুষ সম্বন্ধে পৃথিবীর কেউই দাবী করিতে পারে না যে, তাঁহারা নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ছিলেন, আহলেহাদীছ পথ পরিত্যাগ করিয়া মুসলিমগণ তাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহকেই মূল কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত কেন্দ্রবিমুখ বলয়ের প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশাবলীতে তাঁহাদের উল্লিখিত আপনাপন মনগড়া কেন্দ্রসমূহের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। আর সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'এলাহী ওয়াহী'-কে এইরূপ কলুর বলদে পরিণত করার ভয়াবহ কার্যকে তাঁহারা সমন্বয় সাধন বা তৎবীকে ও তাওফীক নামে অভিহিত করিতেছেন।

فما الله وما للعجاب

এই ভয়াবহ আচরণের নাম যদি সমন্বয় সাধন হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্র শপথ, পৃথিবীতে অপপ্রয়োগ Perversion বা তাহরীফ ও তাবদীল বা পরিবর্তন বলিয়া কোন কার্যের অস্তিত্ব নাই এবং এবং ইহূদী ও খ্রীষ্টানগণ স্ব স্ব গ্রন্থে কোন দিন তাহরীফ করেন নাই।

ولتحقيق ان العصبة للانبياء من عداهم قد يخطي وقد يصعب فمن ظن انه يكتفي بما وقع في خاطره مما ما جاء به الرسول فقد ارتكب اعظم الخطاء و ضل ضلالا مبينا.

'প্রকৃত কথা এই যে, নিষ্পাপ হওয়া শুধু নবীগণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের ছাড়া অপর সকলের মধ্যেই ভ্রান্তি ও সঠিকতা উভয়ের অবকাশ রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, রাসূলের আদর্শ ব্যতিরেকে তার কল্পনাই তার জন্য যথেষ্ট হইবে সে মহাপাতকে পতিত হইয়াছে এবং স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হইয়াছে'।

কুরআন ও সুন্নাতের মর্মকেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার ফলে মুসলিমগণের জাতীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র ফের্কাবন্দীর অভিশাপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনকে গ্রোথিত, সংহত সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করার স্বর্গীয় রজ্জুস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। এই আয়াতের নাস্তিবাচক অংশটুকু অনেকেই আওড়াইয়া থাকেন; কিন্তু অস্তিবাচক অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়া তেমন আবশ্যক বিবেচিত হয় না।

**হাবলুল্লাহ বা আল্লাহ্র রজ্জুর তাৎপর্য কী?**

আলী, আবু সাঈদ খুদরী, মা'আয বিন জাবাল, হুযায়ফা, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, যায়েদ বিন ছাবেত ও যায়েদ বিন আকরাম প্রভৃতি ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাচনিক কুরআনকে হাবলুল্লাহ্র অর্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন *(তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে জারীর প্রভৃতি)*। অতএব আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মুসলিমগণ যদি তাফরীক বা জাতীয় জীবনের বিশৃংখলা হইতে বাঁচিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাদেরকে আল্লাহ্র রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, শুধু জাতীয়তা (Nationality) দেশ বা বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে যদি মুসলিমগণ একত্রিত হইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের এই প্রেরণার নাম কুরআনের ভাষায় হইবে حمية الجاهلية 'অন্ধ যুগের গোঁড়ামী' এবং তাহাদের Slogan বা ধ্বনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় হইবে, دعوة الجاهلية অন্ধ যুগের Slogan.

আল্লাহ্র রজ্জুর বন্ধন শিথিল করিলে অথবা উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে মুসলিমদের রেনেসাঁ বা মুক্তিযুগের আগমন হইবে না। বরং তাফরীক, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। কুরআন আল্লাহ্র সেই সুবর্ণ রজ্জু এবং হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'হে রাসূল (ছাঃ)! আমি কুরআনকে আপনার নিকট এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, মানব জাতির প্রতি যে সকল আদেশ অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা আপনি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া জানিয়া দিবেন' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার্তাবাহক বা Postman অথবা Messenger মাত্র নয়, কুরআনকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার ভার রাসূলে কারীমের উপর অর্পিত হইয়াছিল। রাসূল (ছাঃ) তাঁহার জীবনব্যাপী আচরণ ও উক্তির সাহায্যে কুরআনের শব্দ ও অক্ষরগুলিকে জীবন ও কর্মে রূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি, আচরণ ও সম্মতির নাম হাদীছ বা সুন্নাত; উহাই কুরআনের ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে কুরআনের এই ব্যাখ্যা বা সুন্নাতও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মানসপ্রসূত বা কপোলকল্পিত নয়, উহাও প্রত্যাদেশ বা অহী।

আল্লাহ তদীয় রাসূল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বাক্য উচ্চারণ করেন না; যাহা বলেন, তাহা অহি-র দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিয় থাকেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকল মীমাংসা আল্লাহ্র অনুমোদিত, অভিপ্রেত এবং আল্লাহ্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ বলিয়াছেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ 'হে রাসূল (ছাঃ)! আমি সত্য সহকারে আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আপনি আল্লাহ্র নির্দেশ মত মানুষের সকল মতভেদ ও কলহ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন' *(নিসা ৪/১০৫)*।

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বীকারোক্তি ব্যতীত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা'য় অঙ্গীকার যেরূপ অর্থহীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক ও প্রমাণিত হাদীছকে বাদ দিয়া কুরআনকে মান্য করার দাবীও সেইরূপ নিরর্থক। পৃথিবীতে মুসলিমগণের ভিতর যতগুলি ভ্রান্তদলের উদ্ভব হইয়াছে, যথা : খারেজী, নাসেবী, রাফেযী, ইমামী, মু'তাযিলা, মুশাব্বেহা, জাহমিয়া, মুর্জিয়া প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে একটি দলও কুরআনকে অমান্য করে নাই; বরং প্রত্যেক দল স্ব স্ব মতবাদের সত্যতার প্রমাণ কুরআন হইতে প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। সুন্নাতকে পরিহার করিয়া স্ব স্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা তাহারা শত সহস্র পথে ও মতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৬৩১ হিজরীর আলেম ও ফকীহ ইমাম আবুল ফাযায়েল আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুযাফফর রাযী হানাফী তাঁহার 'হুজাজুল কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদ কুরআন হইতে সাব্যস্ত করিয়া এক মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিরা উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া দেখলে আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যতগুলি লোক পয়গম্বরীর দাবী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, এমনকি কাদিয়ানী ও বাবী বাহায়ী উপনবীরা পর্যন্ত স্ব স্ব নবুওতের পোষকতায় কুরআনকেই অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে *(দেখুন : বাহায়ী গ্রন্থ, কিতাবুল ফরাইদ, পৃঃ ৩৩৪; কাদিয়ানী গ্রন্থ : সীরাতুল মাহদী ২/১৮২ পৃঃ; মিরযা গোলাম আহমাদের লেকচার শিয়ালকোট, পৃঃ ৩২; মনযুর ইলাহী, পৃঃ ২৩১ ইত্যাদি)*।

এই জন্য ওমর বিন খাত্তাব আমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, إِنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. 'এমন একটি দলের উদ্ভব হইবে যাহারা কুরআনের অস্পষ্টাংশ লইয়া তোমাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবে, ঐরূপ লোকদের বিতর্কেও উত্তরে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সুন্নাতের (অস্ত্র)

ব্যবহার করিও, কারণ হাদীছ অনুসরণকারীরাই কুরআনের বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী' *(সুনানে দারেমী, পৃঃ ২৮, হা/১২১)*।

মোটকথা কুরআন ও হাদীছের সম্মিলিত ব্যবস্থা বা কোডের নাম হইতেছে ইসলাম। সুঈজ, টার্কিশ বা ইংলিশ ব্যবস্থার বা আইনের নাম যেরূপ ইসলাম নহে, কোন ফকীহ, দরবেশ বা দেবতা ও ইমামের ব্যক্তিগত অভিমত বা সিদ্ধান্তও সেইরূপ এলাহী ব্যবস্থার আসন অধিকার করিতে পারে না। মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনের ভারকেন্দ্র হইতেছে কিতাব ও সুন্নাত। উহাই তাহাদের সুবিন্যস্ত জাতীয়তার সংহতি কেন্দ্র। যেদিন হইতে মুসলিমগণের জাতীয়তা কুরআন ও সুন্নাতের দৃঢ়বন্ধন হইতে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে সেইদিন হইতেই কলহ, বিবাদ, হিংসা ও বিদ্বেষের অভিশাপে তাহারা অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অভিসম্পাতের দরুন মুসলিমগণের এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জাতীয়তা বিভিন্ন ফের্কা, মার্কা ও দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে আর এই ফের্কাবন্দীর অগ্নিকাণ্ডে মুসলিম জাতীয়তার গগণস্পর্শী প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মীভুত হইয়াছে।

وذلك تقدير العزيز العليم

**'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** পৃথিবীর মুসলিমদিগকে তাহাদের পরিত্যক্ত ভারকেন্দ্রে কিতাবুল্লাহ বনাম সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায় এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মনোনীত অখণ্ড মুসলিম জাতিকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে বাসনা রাখে :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে (Private affairs) পরিণত হইয়াছে; পার্থিব জীবনের সহিত ধর্মের কোন সংশ্রব তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্মের এই সংজ্ঞা বর্তমান সময়ে ইসলাম জগতের সর্বত্র দ্রুতভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্তান, মিসর ও আরব সর্বত্রই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভৌগলিক সীমা ও বর্ণগত ভিত্তির উপর নব জাতীয়তার প্রাসাদ বিরচিত হইতেছে। হিন্দের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট মুসলিম জননায়কের মুখেও আমরা শুনিতে পাই যে,

Religion should not be allowed to come into politics. Religion is merely between man and god.

'ধর্মকে রাজনীতির ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় ব্যাপার মানুষের এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব ব্যাপার মাত্র'। কিন্তু ধর্মের এই ব্যাখ্যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ ও সঠিক নয়।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী কৃষ্টি, আদর্শবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আল্লামা ডক্টর শায়খ মুহাম্মাদ ইকবাল যেরূপ গভীর পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেরূপভাবে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অন্য কেহ পারিয়াছেন কি-না, তাহা আমার জানা নাই। সুতরাং ইসলামী আদর্শের দার্শনিক ব্যাখ্যা যতটা সুন্দর ও সঠিকভাবে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, অন্য কোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে সেরূপভাবে আমি শ্রবণ করি নাই।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবাল বলিতেছেন, The conclusion to which Europe is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life. Islam dose not bifureate the unity of man into an irrecon, cilable duality of spirit and matter. In Islam God and the universe, spirit and matter, church and state are organic to each other. man is not the citizen of a profane world to be renounced in the interest of world of spirit situated elsewhere.

To Islam matter is spirit realizing itself in space and time. Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter probably from Manichaean thought. Her best thinks are realizing this intial mistake to-day, but her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma.

ভাবার্থ এই যে, 'ইউরোপ বিভিন্ন কার্যকারণ পরম্পরায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা এই যে, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্ব ব্যাপার মাত্র। যাহাকে বৈষয়িক জীবন বলে, তাহার সহিত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইসলামের কাছে মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অদ্বৈত ও অবিচ্ছিন্ন। ইসলামে জড় ও আত্মার এরূপ দ্বিত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই যাহাদের সংযোগ ও সংমিশ্রণ সম্ভবপর নয়। ইসলামের আদর্শবাদের দিক দিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টজগত উপাসনালয় ও আইন সভার প্রাসাদ, জড় ও আত্মা অবিচ্ছিন্নরূপে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। মানুষ এমন অপবিত্র পৃথিবীর অধিবাসী নয় যে, স্বর্গরাজ্য লাভ করিবার আশায় তাহাকে এই অপবিত্র স্থান বর্জন করিতে হইবে। ইসলামী আদর্শ অনুসারে আত্মা যখন স্থান ও কালের সীমার ভিতর দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাহাকে জড় নামে অভিহিত করা হয়। মনে হয় যেন ইউরোপ কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করিয়াই জড় ও আত্মার দ্বৈতবাদের অভিমত মানির (২১৬-২৭৭ খৃঃ) মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে যদিও তাহাদের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কগণ তাহাদের এই ভ্রান্তির কথা অনুভব করিতেছেন; কিন্তু কূটনীতি বিশারদগণের একদল এখনও যিদ ধরিয়া বসিয়া আছেন যে, পৃথিবী আত্মা ও জড়ের দ্বৈতবাদকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করুক' *(Presidential Speech, All India Muslims league, 29th December.1930, P.5.)*

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে ইসলাম ইউরোপের Religion নয়। উহা Organised Religion, উহা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা (Private affairs) নয়; উহা দ্বীন এবং শরী'আত। ধর্মের প্রভাব কেবল মসজিদে ও কবরস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিবে না; ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হইতে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রভাব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেক স্তরে, জীবনের কর্মসাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান ও অপ্রতিহত ভাবে কার্যকরী রহিবে।

মুহাম্মাদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন, দ্বীনে হক্বের তাৎপর্য ইহাই। মানব জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে এই দ্বীনে হক্বকে জয়যুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই রাসূলে কারীম (ছাঃ) আগমন করিয়াছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

'আল্লাহ তদীয় রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য বিধান সহ পৃথিবীতে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে সমগ্র মানবীয় বিধানকে পরাভূত করিয়া সেই সত্য সনাতন বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে' *(ফাতাহ ৪৮/২৮)*। *(ক্রমশঃ)*

***[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ১৩-২৪]***

# নারীবাদী লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম

*[থেরেসা করবিন একজন লেখিকা। বসবাস করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে। তিনি ইসলামউইচ ডটকম-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অন-ইসলাম ডটকম ও অ্যাকিলা স্টাইল ডটকম-এর একজন সহযোগী। সিএনএন তার একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। নিম্নে তা প্রকাশ করা হল]*

আমি একজন মুসলিম কিন্তু পূর্বে ছিলাম একজন ক্যাথলিক। ৯/১১-এর দুই মাস পর অর্থাৎ ২০০১ সালের নভেম্বরে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

আমার বয়স ২১ বছর। আমি লুইজিয়ানার বাটন রূজে বাস করতাম। মুসলিম হওয়ার জন্য এই সময়টি খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে নিয়ে চার বছর গবেষণার পর বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও তাদের অনুসারীদের প্রশ্নের জবাব দিতে এবং তাদের জাগিয়ে তুলতে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই।

আমি একজন ক্রেওল ক্যাথলিক এবং একজন আইরিশ নাস্তিক পিতামাতার সন্তান। আমি ক্যাথলিক হিসাবে বড় হয়েছি। তারপর একসময় সংশয়বাদী হই এবং বর্তমানে আমি একজন মুসলিম।

১৫ বছর বয়সে হোস্টেলে থাকার সময় থেকেই ইসলামের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে। ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। আমার শিক্ষক এবং যাজকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাদের কাছ থেকে উত্তর আসে, তোমার এই সুন্দর ছোট্ট মাথায় এ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, যা আমাকে কখনই সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

আমেরিকার নারী পুরুষেরা সচরাচর যেমনটি করে থাকে আমি তার বিপরীতটি করেছি। আমি এ সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম। বহু বছর ধরে আমার মনে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষ এবং মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জন্মাতে থাকে। এ সবকিছু নিয়ে গবেষণার পর আমি সত্যকে খুঁজে পাই। ধর্মীয় অলঙ্করণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন মতবাদ ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি ইসলাম নামের এই অসাধারণ জিনিসটি খুঁজে পাই।

আমি এটা শিখেছি যে, ‘ইসলাম একটি সংস্কৃতি কিংবা ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা নয়। এটি শুধুমাত্র বিশ্বের একটি অংশেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং ইসলামই হচ্ছে একটি বিশ্বধর্ম, যা মানুষকে সহনশীলতা, ন্যায়বিচার ও সম্মান করতে শেখায় এবং ধৈর্যধারণ, বিনয়ী এবং ভারসাম্যকে উৎসাহিত করে’।

আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছি। আমি এটি দেখে বিস্মিত হয়েছি আমার পাশে অনেক লোক আমার সাথে অনুরণিত হচ্ছে। আমি এটি খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম, যা ইসলাম তার অনুসারীদের শেখায়।

ইসলাম আদম থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের সম্মান করতে শিক্ষা দেয়, যাদের সবাই মানবজাতিকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সাথে আচরণ করতেন।

ইসলামের একটি আবেদন আমাকে আকৃষ্ট করেছে। যেমন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উৎসাহব্যঞ্জক একটি উদ্ধৃতি। তিনি বলেন, ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক, হোক সে পুরুষ কিংবা মহিলা’। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই, যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম চিন্তাবিদ কর্তৃক। যেমন আল-খাওয়ারিজমির বীজগণিত আবিষ্কার, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বহু আগেই ইবনে ফারনাসের ফ্লাইট বলবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন এবং আবু আল-কাসিম আল-জাহরি যাকে বলা হয় আধুনিক সার্জারির জনক।

এটি ছিল ২০০১ সাল, যখন আমাকে কিছুদিনের জন্য আমার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। আমি ভয়ে ছিলাম লোকেরা কি মনে করবে, যা ছিল আমার জন্য চূড়ান্তরূপে দুর্বিষহ। ৯/১১-এর অপহরণকারীদের কর্ম আমাকে চরম আতঙ্কিত করে তোলে। কিন্তু তার পরমুহূর্ত থেকে আমি আমার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি মুসলিমদের সাথে এবং তাদের ধর্মকে রক্ষার জন্য। কদাচিৎ মুসলিমের কিছু খারাপ পদক্ষেপের কারণে ১.৬ বিলিয়ন মানুষের একটি গ্রুপ তৈরী হয়েছে, যারা সবাই অত্যন্ত আগ্রহী ইসলামকে সমূলে উৎখাত করতে। সেইসকল লোকদের হতে ইসলামকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছি।

অন্যদের মতামতের কারণে আমাকে জিম্মি করা হয়েছিল। ইসলামকে রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত ভয়কে জয় করেছি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার ভাই ও বোনদের সেই বিশ্বাসে নিয়ে যেতে যা আমি বিশ্বাস করি। এটা আমার পরিবার বুঝতে পারেনি; কিন্তু ধর্ম নিয়ে গবেষণা করাটা তাদের কাছে মোটেও আশ্চর্যজনক ছিল না। তাদের অধিকাংশই আমার নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সৌভাগ্য যে আমার বন্ধুদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী ছিল এবং এমনকি এ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাইত।

**স্কার্ফ প্রসঙ্গে :**

বর্তমান দিনগুলোতে হিজাব পরিধান করে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আপনি এটিকে স্কার্ফ বলতে পারেন। আমার স্কার্ফ আমার হাতে বাধা থাকে না এবং এটি জুলুম, নির্যাতনের কোনো হাতিয়ারও নয়। এটি আমার চিন্তাধারায় প্রবেশ করতে কোনো বাধা প্রদান করে না।

ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করায় আমার সব সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণা তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত হয়নি। আমাকে প্রাচ্যের নারীর কল্পচিত্র আঁকতে হয়েছে। আমার ধারনা ছিল প্রাচ্যের পুরুষরা নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং পুরুষ কর্তৃক তাদের বাধ্য করা হয় তাদের শরীরকে ঢেকে রাখার জন্য।

কিন্তু যখন আমি একজন মুসলিম নারীকে জিজ্ঞেস করি, কেন আপনি হিজাব পরেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহকে খুশি করার জন্য। হিজাব পরিধান একজন নারী হিসাবে আমাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং পুরুষের হয়রানির শিকার থেকে এটি আমাদের নিরাপদ রাখে। পুরুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে আমার নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটি খুবই কার্যকরী'। তার উত্তর ছিল সুস্পষ্ট এবং অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয়ার মত। আশ্চর্যজনকভাবে ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা আমার দীর্ঘদিনের নারীবাদী আদর্শের সাথে মিলে গেছে।

তিনি শালীন পোশাককে বিশ্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'একজন নারীর শরীর শুধুমাত্র উপভোগের জন্য অথবা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখার জন্য নয়'। শালীন পোশাক কেমন করে বিশ্বের প্রতীক? প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাসে নারীদেরকে কি এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত আচরণ করা হয় না?'

ধৈর্যশীল এই মুসলিম ভদ্র মহিলা ব্যাখ্যা করেন যে, একটি সময় ছিল যখন পশ্চিমা বিশ্বে নারীদেরকে বিবেচনা করা হত পুরুষের ভোগদখলের সম্পত্তি হিসাবে। কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্‌র চোখে নারী-পুরুষ সবাই সমান।

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতিকে মর্যাদা দেয় এবং নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হবার, নিজস্ব সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা পরিচালনা করা এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে ১২৫০ বছর পূর্বে ইসলাম নারীদের যে অধিকার প্রদান করেছে সেটি পশ্চিমারা কখন কল্পনাও করতে পারেনি।

**বিবাহিত জীবন :**

সম্মানিত পাঠক! এটা জেনে হয়ত আপনি আশ্চর্য হতে পারেন যে, আমাকে পারিবারিকভাবেই বিবাহ করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আমাকে বাবা-মায়ের প্রথম পসন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলাদিনের জেসমিনের মত আমাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়নি। আমার বাবা আমার পসন্দকে না করেনি, এমনকি একটি কথাও বলেনি।

আমি যখন ধর্মান্তরিত হই তখন সময়টি মুসলিম হওয়ার জন্য মোটেও ভাল সময় ছিল না। আমি সারাক্ষণ বিচ্ছিন্নতাবোধ অনুভব করতাম। নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যাখ্যাত আমাকে বাধ্য করে আমার পরিবার জীবন শুরু করতে। এমনকি ধর্মান্তরিত হবার পূর্বেও আমি সবসময় একজন ভাল মানুষের সাথে সম্পর্ক করতে চেয়েছি কিন্তু আমি এমন কোনো পুরুষকে খুঁজে পাইনি যারা আমার আদর্শের কাছাকাছি।

আমি জানতাম, মুসলিম হওয়াটা আমাকে সত্যিকার ভালবাসা এবং ভাল জীবন সঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আমি সিদ্ধান্ত নেই, একজন ভাল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইলে এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমি পারিবারিকভাবেই বিবাহ করতে চেয়েছি। আমি অনুসন্ধান করেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি, আমার বন্ধুদের এবং পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে।

আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার মত অন্য একজন ধর্মান্তরিতকে বিয়ে করতে। যিনি হবেন আমার মতই এবং তার গন্তব্যও হবে আমার মত যেখানে আমি যেতে চাই।

আমার পিতামাতা ও বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার স্বামীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি যিনি আমার মতই একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম। আমার স্বামী আলাবামাতে থাকতেন, যা আমার নিউ অরলিন্সের বাসা থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। বারো বছর পরেও আমরা আগের মতই সুখে বসবাস করছি।

সব মুসলিম তার সঙ্গিনীকে এই পদ্ধতিতে খুঁজে পায় না এবং আমিও আমার জীবন এমনটি কখনও কল্পনা করিনি। কিন্তু আমি আনন্দিত যে, ইসলাম আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে এই অপশনটি গ্রহণ করার।

**৯/১১ পরবর্তী বসবাস ও দুর্বিষহ জীবনের পদচারণা :**

মুসলিম হওয়ার পর আমি আমার ব্যক্তিত্বকে আমার আমেরিকান পরিচয় বা সংস্কৃতিকে কখনই ত্যাগ করিনি। কিন্তু একটি সময়ে তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এবং আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য এগুলোকে ত্যাগ করতে হয়।

আমার দিকে থুথু ও ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং আমাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে যেন আমি গাড়ি চাপায় মারা যাই।

জর্জিয়ার সাভান্নাহ মসজিদে ছালাতের জন্য উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীদের ভয় আমাকে সর্বদা তাড়া করত। সাভান্নাহ মসজিদে ছালাতে যাওয়ার সময় আমাকে প্রথমে গুলি করা হয়, তারপর সন্ত্রাসীরা মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেয়।

২০১২ সালের আগস্টে আমি নিউ অর্লিন্সের বাড়িতে ফিরে আসি যেখানে আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। পরিশেষে আমি একটি সময়ের জন্য নিরাপদ অনুভব করলাম।

কিন্তু এখন আইএস নামে একটি দলের অনৈসলামিক কার্যক্রমের জন্য ক্রমাগতভাবে তারা বিশ্ব মিডিয়ার শিরোনাম হচ্ছে। আইএসের কারণে আমাকে একই ধরনের আচরণের শিকার হতে হচ্ছে যেমনটি অন্য শহরে আমার সাথে করা হয়েছিল এবং এখন আমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে খুবই শংকিত, যেমনটি আগে কখনো বোধ করিনি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করা ও ইসলামকে বিকৃত করা এবং অন্যায়ভাবে ইসলামকে হাতিয়ার ব্যবহার করা আমাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে।

আমার দেশের লাখ লাখ লোক আমাকে ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আইএসের এই কর্মকাণ্ড দেখে আমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে। আমি মনেপ্রাণে তাদের এই কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করি। তাদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য যারা আমাকে ঘৃণা করতে থাকে তারা আমার বিশ্বাস সম্পর্কে না জেনেই আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। এটি আমাকে মাঝে মাঝে অসহনীয় করে তুলে। সর্বোপরি আমার মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, আমার সহকর্মী আমেরিকানরা সকল প্রকার ভয় এবং ঘৃণার উর্ধ্বে উঠে আমার মত একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে ইনশাআল্লাহ।

# আল্লাহই পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক

*-মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম (উজ্জ্বল)*

পবিত্র আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির উপর অবতারিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এটা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা। অন্যান্যদের মু'জেযা ছিল যুযোপযোগী। তাই তাদের জীবন অবসানের সাথে সাথে মু'জেযাগুলোরও পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আমাদের নবীর শ্রেষ্ঠ মু'জেযা হল আল-কুরআন, যা চিরস্থায়ী ও চিরন্তন। যতদিন অতিক্রম করছে এর মাহাত্ম্য ও রহস্য ততই উন্মোচিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এর চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ দিন বা রাত কুরআন পাঠ করে কিন্তু বিরক্ত হয় না। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এ এক অনন্য প্রকাশ। আল-কুরআনের অসাধারণ বাকরীতি, অনুপম ভাষাশৈলী, ভাবের গভীরতা, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, শব্দচয়ন, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি একে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অলংকৃত করেছে। কুরআনের অলংকারপূর্ণ আয়াতসমূহ আরবের যুগশ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। বার বার চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের মত ছোট একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি। যুগে যুগে অনেকেই কুরআনের বিরোধিতায় কিছু রচনার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। তবে তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে যারা কুরআনের মতো কিছু রচনা করেছে, তারা তাদের জীবদ্দশাতেই মিথ্যাবাদীরূপে আখ্যায়িত হয়েছে এবং তাদের রচনাবলী আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হলেও কুরআনের মত একটি আয়াত বা সূরা রচনা করা কখনই সম্ভবই নয়।

আল-কুরআনের অসাধারণ বাকরীতি, অনুপম ভাষাশৈলী, ভাবের গভীরতা, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, শব্দচয়ন, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি একে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অলংকৃত করেছে। কুরআনের অলংকারপূর্ণ আয়াতসমূহ আরবের যুগশ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। বার বার চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের মত ছোট একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি। যুগে যুগে অনেকেই কুরআনের বিরোধিতায় কিছু রচনার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। তবে তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে যারা কুরআনের মতো কিছু রচনা করেছে, তারা তাদের জীবদ্দশাতেই মিথ্যাবাদীরূপে আখ্যায়িত হয়েছে এবং তাদের রচনাবলী আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হলেও কুরআনের মত একটি আয়াত বা সূরা রচনা করা কখনই সম্ভবই নয়।

সুধী পাঠক! উম্মী নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন তৎকালীন সাহিত্যগর্ভী আবর জাতিকে স্তব্দ করে সম্পূর্ণ নতুন আরবী ভাষায় কুরআন উপস্থাপন করলেন তখনই তারা এটাকে অবিশ্বাস করেছিল। তার উপর জাদুকর, মিথ্যাবাদী সহ মোট ১৫টি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিল হত্যা করার। তারা ধারণা করত যে, এই নিরক্ষর লোকটির মুখ দিয়ে এত সুন্দর কাব্যিক ছন্দের অবতারণা কিভাবে সম্ভব। অতঃপর তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সব মিলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩)*।

**চ্যালেঞ্জের কারণ :**

প্রথমতঃ একদিকে কুরআনের এই চিরন্তন আহ্বান অন্য দিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধীশক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল, শক্তি সামর্থ ও মান ইয্যত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু এই সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কুরআনকে অপরাজেয় প্রমাণ করতে যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআন ও তার নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্মোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও আরবী ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কুরআন তাদের লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কুরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়ত এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অযুহাত পেশ করা যুক্তি সঙ্গত হতে পারত; কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা শৈলীর আঙ্গীক সম্পর্ক ও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতি চেয়ে আরবরাই ছিল বেশি উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হত, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবেলা কোন ব্যাপারই ছিল না। বরং এর চাইতে উন্নত মানের কালাম রচনা করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলেও, কুরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুয়োগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমগ্র

আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরী করতে পারল না এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত পারবে না।

**কুরআন আল্লাহ্র বাণী : মানুষের নয়**

পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ্র বাণী এবং তা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সব মিলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্র নিকট হতে অন্য কোন কিতাব নিয়ে এস, যা সৎ পথ প্রদর্শনে এ দু'ট, (কুরআন ও তাওরাত) অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হয়, তাহলে আমিও তার অনুসরণ করব' *(ক্বাছাছ ২৮/৪৯)*। তিনি আরো বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য যদি তোমরা সকল মানুষ ও জিন পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও অনুরূপ কুরআন রচনা করে আনতে সক্ষম হবে না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথবা তারা কি বলে যে, এটা তুমি নিজেই রচনা করেছ? বলে দাও তাহলে তোমরা ও অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহকে ছাড়া আর যাকে ইচ্ছা ডাক যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(হূদ ১১/১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আর এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা নয়; বরং এটা তো এর পূর্বে অবতারিত কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী ও ব্যাক্ষ্যা গ্রন্থ, এত কোন সন্দেহ নেই যে, এই কুরআন সারা জাহানের রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে' *(ইউনুছ ১০/৩৭)*। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরও অনেক জায়গায় কুরআন যে আল্লাহ্র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আর মক্কার ঐ সব লোক যাদের মাতৃভাষা আরবী ছিল এবং নিজেরা নিজেদের বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য গর্ববোধ করত তারা সবাই এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা এর মত একটি ছোট সূরা ও রচনা করতে পারেনি।

**আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণকারী :**

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ১৫/৯)*। প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা (রহঃ) বলেন, কুরআন মাজিদের যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ 'ইহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে আল্লাহ্র গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে' *(মায়েদা ৫/৪৪)*। একারণেই যখন ইহূদী ও খ্রিষ্টানরা হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আমি নিজেই এর সংরক্ষক'। আল্লাহ তা'আলা নিজে এর হেফাযতের দায়িত্ব নেওয়ার কারণে শত্রুরা হাযারও চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি আয়াত তো দূরে থাক এর একটি নুক্তা, যের, যবরের পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালাতের যুগের পর আজ সাড়ে চৌদ্দশত বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলিমদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা থাকা সত্ত্বেও কুরআন মুখস্ত করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববত অব্যহত রয়েছে। প্রতিযুগেই লাখ লাখ বরং কোটি কোটি মুসলিম যুবক, বৃদ্ধ এবং বালক-বালিকা এমন থাকে, যাদের বক্ষ পিঞ্জরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাত বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

**আল-কুরআন ইলাহী সংরক্ষণ, ইহূদী পণ্ডিতের উক্তি :**

আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহূদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি ও পোশাকের দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। সভা শেষে খলীফা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী ইহূদী? সে স্বীকার করল। মামূন (খলীফা) পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, 'তুমি যদি মুসলিম হয়ে যাও তাহলে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে'। সে উত্তরে বলল, 'আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না'। কথাবর্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল কিন্তু এক বছর পর সে মুসলিম হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল।

সভা শেষে খলীফা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিল?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তি'। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলিম হওয়ার কী কারণ ঘটল?' সে বলল, 'এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমানে কালে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ। স্বহেস্ত গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কফি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ কম করে লিখলাম। অতঃপর কপি গুলো নিয়ে আমি ইহূদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহূদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপি গুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম বেশকরে লিখে খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রীষ্টনরা খুব খাতির যত্নকরে কপি গুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কমবেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে বিক্রায়ার্থে বের হলাম। অতঃপর যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি-না যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিল। এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করেছেন। এরপর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। অন্যান্য আসমানী কিতাব বিকৃত হলেও কুরআন বিকৃত হয়নি এটা কুরআনের অন্যতম একটি মু'জেযা *(তাফসীর মাআরেফুল কুরআন : অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন, পৃঃ ৭২৬)*। [সুবহানাল্লাহ]

***[লেখক : বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, দর্শন বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ ও ইমাম, মুচড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সাতক্ষীরা]***

# সিন্ধুতীরের করাচীতে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই সপ্তাহ দেশে থাকার পর ৩ এপ্রিল'১৪ আবার ফিরতি যাত্রা। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ-এর সভাপতি হুমায়ূন ভাইয়ের মটরসাইকেলে চেপে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। হঠাৎ করাচী থেকে আমীরুল ভাইয়ের ফোন। আমি কবে পাকিস্তান ফিরছি সেই খোঁজ নেয়ার জন্য। আজ সকালে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও উনার ফোন বন্ধ পেয়েছিলাম। করাচী নেমে প্রথমে উনার ওখানেই ওঠার প্ল্যান আমার। সেকারণে উনার সাথে যোগাযোগ করতে না পারায় মনটা খচখচ করছিল। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ তাঁর ফোনটা পেয়ে তাই মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল। এয়ারপোর্টে নেমে হুমায়ূন ভাই আর আমাদের বংশাল অফিসের নতুন কর্মচারী ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গতকাল এসে ফেরত গিয়েছিলাম ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে যাওয়ার কারণে। 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক জনাব ড. কাবীরুল ইসলাম ও ছোটভাই নাজীব বিদায় দিয়ে চলে যাওয়ার পর পরই ফ্লাইট ক্যানসেল হওয়ার ঘোষণা হয়। এমন বিড়ম্বনায় পড়াটা অবশ্য বেশ মধুর...দেশের মাটিতে অবস্থানের মেয়াদটা তো কিছুটা বাড়ল! বংশাল অফিসে আবার ফিরে আসলাম। সন্ধ্যার পর জানতে পারলাম পরদিনই ফ্লাইট পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহর রহমতে আজ আর কোন সমস্যা হয়নি। ইমিগ্রেশনে ঢোকার সময় দেখি এক দুঃখজনক দৃশ্য। মালয়েশিয়াগামী কয়েকজন শ্রমিক ছিল আমার সামনে। তাদেরকে নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসাররা রীতিমত তামাশা শুরু করেছে। ২২/২৩ বছরের এক যুবককে অফিসার গন্তব্য জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'মালাশিয়া'। আবার জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর আসল। অফিসারটি এবার কাজ-কাম ফেলে বললেন সঠিক উচ্চারণে বল 'মালয়েশিয়া', নতুবা তোমাকে ছাড়ব না। অবশেষে অফিসারের সাথে ১০/১৫ বার পুনরাবৃত্তি করার পর সঠিক উচ্চারণটা সে ধরতে পারল। দৃশ্যটা সাময়িক হাসির খোরাক যোগালেও উপলব্ধি হল, এভাবেই একেবারে অশিক্ষিত অবস্থায় ছেলে গুলোকে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা। অথচ বিদেশ গমনের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া যেত, যাতে তারা আত্মমর্যাদার সাথে সম্মানজনক পেশায় বিদেশের মাটিতে নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারে। এতে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হ'ত। কিন্তু তাদের অবহেলার ফলে এই অনভিজ্ঞ শ্রমিকরা বিদেশের মাটিতে যেমন নানাদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে, তেমনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের সম্পর্কে নিচু ধারণা তৈরী হচ্ছে। কোন ভিনদেশীর মুখে নিজ দেশের বদনাম শুনতে যে কত খারাপ লাগে তা প্রবাসী মাত্রই খুব ভালভাবে জানেন।

বেলা দেড়টায় পিআইয়ের মাস্কাটগামী সুপরিসর দ্বিতল বিমানটি উড়াল দিল করাচীর উদ্দেশ্যে। যাত্রীদের মধ্যে যথারীতি বাংলাদেশী শ্রমিকদেরই আধিক্য। এমনিতে সবসময় নতুন কিছু দেখার বা জানার একটা কৌতুহল থাকে আমার। কিন্তু আজ সবকিছু বিরস মনে হচ্ছে। কারো সাথে আলাপ জমাতেও আর ইচ্ছে হলো না। প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়ার পার্থক্যটা সত্যিই অনেক। কেবলই সীটে গা এলিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশাল নীল আকাশের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে এক অভিভূত কল্পনায় ডুবে থাকি।

স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে চারটার দিকে ধুসর করাচী শহরের উপরে খুব নীচু হয়ে দু'চক্কর দিয়ে বিমানের চাকা আলতোভাবে স্পর্শ করল জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে। খানিক পূর্বে ইউফোনের সীমটা মোবাইলে ভরতেই আমীরুল ভাইয়ের ফোন পেয়ে গেছি। উনি ঘণ্টাখানিক আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। ইমিগ্রেশনে ভীড় থাকায় ফর্মালিটি শেষ করে বের হতে প্রায় ঘণ্টাখানিক দেরী হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে আসতে আমীরুল ভাই, তাঁর ছোট ছেলে আব্দুর রহমান আর মাদরাসার এক কর্মচারীকে পেয়ে গেলাম। কুশল বিনিময় শেষে একটা ট্যাক্সিতে রওয়ানা হলাম আমরা। সদা ব্যস্ত গমগমে ঢাকা শহর দেখে আসা চোখে পড়ন্ত বিকেলের করাচীকে এক নিস্তরঙ্গ মফস্বলীয় শান্ত-শিষ্ট উপশহর মনে হয়। আধাঘণ্টা বাদে সোলজার বাজারস্থ 'জামে'আ রহমানিয়া মাদরাসা'র গেইটে হাযির হলাম। গতবার এসে পরিচিত হওয়া উপস্থিত শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে কুশল বিনিময় হলো। তারপর হালকা নাশতা-পানি সারলাম। আমীরুল ভাইয়ের ছেলেমেয়ে তিনটা খুবই কিউট। গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই সেই যে ছেঁকে ধরেছে, আর ছাড়াছাড়ি নেই। ওদের এত এত প্রশ্নের উত্তর দিতে রীতিমত হাফিয়ে উঠলাম।

মাগরিবের পর আমীরুল ভাই বললেন, 'কোর্ট রোডে করাচীর প্রাচীন ও কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আজ মাসিক ইজতেমা হচ্ছে, চলুন ঘুরে আসি, অনেক আলেমের সাথে দেখা হবে'। আব্বা ১৯৮৮ সালের ২৫ডিসেম্বর পিএইচডি ট্যুরের সময় এসেছিলেন এই মসজিদে। সেজন্য মসজিদটির নাম, পরিচয় আগেই জানা ছিল। সুতরাং দ্বিরুক্তি করার কারণ ছিল না। কোর্ট রোডের এই মসজিদে পাকিস্তানের বড় বড় আহলেহাদীছ বাগ্মীগণ খত্বীবের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। উর্দূ বাযার থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত এই মসজিদটি আকারেও বেশ বড়।

মটরসাইকেলে প্রায় ১৫ মিনিট যাওয়ার পর মসজিদে পৌঁছলাম। লোকজন ছিল প্রায় শ'দেড়েক। বক্তব্য রাখছিলেন পেশোয়ারের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী। মধ্যবয়সী এই আহলেহাদীছ আলেমের খ্যাতির কথা শুনেছিলাম ইসলামাবাদে। বিশেষ করে তাঁর ১০ খণ্ডের বিশাল ফৎওয়া গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয়, যেটি এখনও চলমান রয়েছে। গেল ফেব্রুয়ারীতে যখন পেশোয়ারে গেলাম, তখন তিনি নাকি আত্মগোপনে ছিলেন। ফলে সাক্ষাৎ করতে চেয়েও সম্ভব হয় নি। আফসোসের ব্যাপার উনার বক্তব্যের সময় বুঝতে পারিনি উনিই শায়খ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী। আমীরুল ভাই উনাকে চিনতেন না। বক্তব্য দিচ্ছিলেন দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্বের উপর। 'আদ-দ্বীন আন-নাছীহাহ' হাদীছটির উপর। বেশ সুন্দর ও তাকৃওয়াপূর্ণ আলোচনা ছিল। বক্তব্যের পর পাকিস্তানী রীতি অনুযায়ী মানুষ উনাকে ঘিরে ধরে সালাম-মুছাফাহা-কুলাকুলিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমাদের সাথেও সালাম হল, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে কথা বলতে পারিনি। মসজিদ থেকে বের হবার পর উনাকে

বডিগার্ডের মত রীতিমত ঘেরাও করে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল কয়েকজন ভাই। মনে হল যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন উনি। বেরিয়ে যাওয়ার পর আয়োজকদের একজন বললেন, উনিই শায়খ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী। শুনে এত আফসোস হলো! জানতে চাইলাম, উনাকে কোথায় পাওয়া যাবে? উনি বললেন, আমরা কেউ বলতে পারব না। উনাকে এখনো আত্মগোপনে থাকতে হয়। কেন আত্মগোপনে থাকতে হয় তাও পরিষ্কার করে কেউ বললেন না। খুব হতাশ হলাম উনাকে এত কাছে পেয়েও কথা বলতে না পেরে।

উনি চলে যাওয়ার পর আয়োজকদের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হলো। বিশেষতঃ আব্বার পরিচয় জানার পর খুব খুশী হলেন উনারা। উনাদের একজন বলে বসলেন আপনাকে বক্তব্য রাখতে হবে। আমি মুখে হাসি টেনে বিনয়ের সাথে অপারগতা জানিয়ে বললাম, 'মাফ করবেন, উর্দূতে এখনও বক্তব্য দেয়ার মত দক্ষতা আসেনি'। জামে'আ আবুবকরের প্রবীণ শিক্ষক করাচীর প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসায়েন বালতিস্তানী যাঁর সাথে একটু আগে আরবীতে কথা হচ্ছিল তিনি বললেন, 'তাহলে আরবীতেই দিন, আমি অনুবাদ করে দেব'। তাঁর কথা শুনে থতমত খেয়ে গেলাম। ভেবেই নিয়েছিলাম নিস্কৃতি পেয়ে যাব এ যাত্রায়। ফলে একদম অপ্রত্যাশিত ছিল উনাদের এমন শক্তভাবে ধরে বসার ব্যাপারটা। বক্তব্য দিতে হবে, তাও আবার আরবীতে! একফোঁটাও যে প্রস্তুতি নেই! বাইরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেও আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে সংকটাপন্ন বোধ করতে লাগলাম।

এ প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি, মঞ্চে আমি কখনই সপ্রতিভ নই। পৃথিবীর আর সমস্ত কাজকে আমি এক পাল্লায় রাখি, আর মঞ্চকে রাখি আরেক পাল্লায়। যাকে বলে স্টেজ ফোবিয়া। কিন্তু নেতার ছেলে হওয়ার 'অপরাধ' আমার কাঁধে। মঞ্চ তাই আমার পিছু ছাড়ে না। সময়ের প্রয়োজনে একদা এই মঞ্চভীতি কাটানোর জন্য গুরুজনদের টিপ্স নিয়ে সবার অজান্তে কোমর বেঁধেই নেমেছিলাম। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া খুব সাধারণ একটা পরামর্শকে নিয়েছিলাম আপ্তবাক্য হিসাবে, 'যখন বক্তব্য দিতে উঠবে, তখন শ্রোতাদেরকে তোমার শিষ্য মনে করবে, তাহলে আর নার্ভাস লাগবে না'। কিন্তু কিসে কি! যতবারই মঞ্চে উঠে ধনুকভাঙ্গা পণ নিয়ে শ্রোতাদেরকে শিষ্যরূপ সরল ভেবে নির্ভার হতে চেয়েছি, ততবারই তাদের সাগ্রহ চেহারা উল্টো বাঘরূপ ভয়ংকর হয়ে চিন্তা-চৈতন্যজুড়ে রাজ্যের সব জড়তার শৃংখল পরিয়ে দিয়েছে। মুহূর্তে এলোমেলো করে দিয়েছে বচন ধারাবাহিকতা। পরবর্তীতে সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে অবশ্য জনসম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে নিয়মিতই। তাছাড়া বয়সের ভারেও অনেকটা স্থিতি এসেছে। কিন্তু সেই জড়তার রেশটা আজও সেভাবে কাটেনি। ফলে মঞ্চের সাথে কখনও সখ্য গড়ে উঠবে–এমন দুরাশা আর করি না। একপ্রকার মেনেই নিয়েছি সীমাবদ্ধতা। কিন্তু মানুষকে তো আর মানানো যায় না। এই দুর্বহ সাজা মাথা পেতে নেয়ার জন্য তাই প্রস্তুত থাকতে হয় যথারীতি।

বরাবরের মত নিরুপায় হয়ে সম্মতি দেই এখানেও। এশার ছালাত শেষে শায়খ বালতিস্তানী আমাকে মেহরাবের কাছে ডেকে নিলেন। তারপর বড়সড় ভূমিকা টেনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ভিতরে ভিতরে ঘামছি আর ভাবছি মাওলানা ছাহেব পরিচয় তো খুব সমারোহে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার যে ফাটা বাঁশের চিপায় আটকা পড়ার দশা। গলাটা শুকনো শুকনো লাগছে। অবশেষে বক্তৃতার পালা শুরু হ'ল। প্রথমে নিজের পরিচয়মূলক, তারপর বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিস্থিতি এবং আব্বার কারাবন্দী হওয়ার ঘটনা, সবশেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। বিরতি না দিয়ে এক নাগাড়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে শেষ করলাম। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শায়খ বালতিস্তানী নোট করছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর এই নোট করা দেখে ততক্ষণে আমার ভিতরে শ্লাঘা আর আত্মবিশ্বাসের মৃদু ধাক্কা অনুভূত হওয়া শুরু হয়েছে। এতদিন দেখে এসেছি বিদেশ থেকে আগত আরব মেহমানদের বক্তৃতা অনুবাদ করার দৃশ্য, আর আজ বিদেশের মাটিতে এই বঙ্গপুঙ্গবের বক্তৃতা অন্য কেউ অনুবাদ করছেন, তা-ও খাতায় নোট করে! বাহ..বাহ ভালোই তো!! সেই অভিঘাত থেকেই কি-না বক্তৃতা গড়পড়তা বেশ ভালই হ'ল। শায়খের মুখে মসৃণ উর্দূ অনুবাদটা শুনে আরো ভালো লাগল। বিশেষ করে আব্বার সকল মামলা থেকে মুক্তিলাভের বিষয়টা জেনে উপস্থিত সবার সমস্বরে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ে ওঠাটা এক অদ্ভুত শিহরণ জাগালো।

তারপর জামে'আ আবুবকরের অপর একজন শিক্ষকের বক্তব্য শুরু হলে আমরা উঠে আসলাম। মসজিদ থেকে বের হয়ে শায়খ বালতিস্তানীর সাথে মসজিদে দোতলায় অফিস ঘরে ঢুকলাম। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তে আহলেহাদীছ ইণ্ডিয়ার সাবেক নাযেমে আ'লা হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, লাইয়ারী টাউনের আলী বিন আবী তালেব মসজিদের খত্বীব ক্বারী মিরাজুদ্দীন, জামে'আ রহমানিয়ার সাবেক মুদীর মাওলানা আযীযুদ্দীন ছাপড়া, কিমারী টাউনের জামে মসজিদ ইবরাহীম খলীলের খত্বীব আবু জাবের দামানোভী, ফযলে আকবার কাশ্মীরী প্রমুখ। শায়খ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সাথে পরিচয় এবং আলাপচারিতার পর সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার এন্তেযামে শরীক হলাম।

খাওয়া শেষে বিদায় নিয়ে ওঠার সময় শায়খ বালতিস্তানী দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের তাফসীরে আহসানুল বায়ানের একটি কপি উপহার দিলেন। তবে সবচেয়ে খুশী হলাম আরেক মুরুব্বীর (নামটা স্মরণ নেই) দেওয়া করাচী শহরে অবস্থিত আহলেহাদীছ মসজিদগুলোর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, বাস রুট এবং রাস্তার নকশা সম্বলিত প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠার পকেট সাইজ একটি গাইডবুক পেয়ে। গাইডবুকের হিসাব অনুযায়ী কেবল করাচী শহরে বর্তমানে ২১৪টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে। চোখ কপালে উঠে গেল হিসাবটা দেখে। উপস্থিত সবাই গাইডবুকটি তৈরীর কাজে মুরব্বীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে খুব প্রশংসা করলেন। এই কাজটা নাকি উনার কাছে নেশার মত। প্রতিটি মসজিদ ঘুরে ঘুরে নিজ উদ্যোগেই সংকলনটি করেছেন। তাঁর কাজ দেখে সেই আরবী প্রবাদটির কথাই মনে হল 'লিকুল্লি ফান্নিন রিজাল' অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের জন্য রয়েছে বিশেষ মানুষ'।

রাত ১০টার দিকে জামে'আ রহমানিয়াতে ফিরে আসলাম। রাতটি কাটালাম সেখানকার মেহমানখানাতেই। আমীরুল ভাই শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর খবর নেয়ার জন্য সহকারী দাউদ ছাহেবকে ফোন করেছিলেন। জানা গেল শায়খ করাচীতেই আছেন এবং পরদিন দুপুরে উনার বাসায় দাওয়াত

দিয়েছেন। একটু পরই আবার ফোন আসল যে শায়খ নিজেই আসবেন জামে'আতে বিকালে। সুতরাং নিশ্চিন্তই ছিলাম এবার অবশ্যই সাক্ষাৎ হচ্ছে। পরদিন সকালে বিশেষ কাজ নেই। আমীরুল ভাইকে বললাম, সকালে নাশতার পর ইউসুফ বিন্নৌরীর জামে'আতুল উলূম আল-ইসলামিয়া মাদরাসা এবং মাওলানা তাক্বী ওছমানীর জামে'আ দারুল উলূম মাদরাসাটি দেখতে যাব।

পরদিন ফজরের পর হাঁটতে বের হলাম। একাই ছিলাম। ক্লিফটন রোডের মাথায় পৌঁছার পর মনে হল সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সমুদ্রের রূপটা দেখে আসলে মন্দ হয় না। একটা সিএনজি নিয়ে সোজা ক্লিফটন সী বীচে চলে আসলাম। খানিক আগে সূর্য উঠেছে। কুসুম কুসুম কাঁচা রোদের ছটায় ঝলমল করছে সৈকত। তীরের দিকে ধীর লয়ে ভেসে আসা স্রোতের মাথায় মুকুটের মত জড়ানো সাদা ফেনার উপর সেই সোনা রঙের অপরূপ বিভা চোখ জুড়িয়ে দেয়। মাছ ধরায় ব্যস্ত একদল মৎস্যজীবী। বিশাল জালটা টেনে তীরে উঠিয়ে মাছের সন্ধানে মগ্ন হয়ে পড়ে। কাছে গিয়ে উৎসুক চোখে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আরব সাগরের বুক থেকে মাত্রই উঠে এসেছে বিশাল জালের এ মাথা থেকে ও মাথা। কিন্তু মাছগুলোর সাথে আমাদের দেশের মজাপুকুর ও খানা-খন্দকের মাছের মধ্যে তফাৎ খুঁজে না পেয়ে হতাশ হই। চ্যাং বা শোল মাছের বাচ্চা কিংবা পুঁটির মত মাছই বেশী। দু'চারটা রুই-কাতলা টাইপের মাছ থাকলেও না থাকার মতই। হাঁটু পানিতে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের তলা থেকে সুড় সুড় করে বালি সরে যাওয়া উপভোগ করি। ঢেউয়ের ধাক্কায় দূর সমুদ্রের অদৃশ্য হাতছানি মোহিত করে তোলে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে ছোট্ট দাঁড় টানা খেয়া নিয়ে মনে হয় এখুনি নেমে পড়ি সমুদ্রের বুকে। দিগন্তের প্রান্তে আকাশটা যেখানে মিলেছে সাগরের সাথে সেদিকটায় তাকিয়ে জীবনটাকে বড় উদার ও নিষ্কণ্টক মনে হয়। যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, দ্বিধা-সংকোচের উর্ধ্বে কেবলই সূচিতা আর অনাবিল প্রশান্তির ব্যঞ্জনা নাড়া দিয়ে যায়। আসমান-যমীনের স্রষ্টার প্রতি নুয়ে আসে শ্রদ্ধাবনত মস্তক। বুকের গহীন থেকে কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসতে চায় কুরআনের সেই আয়াতগুলো... রব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাতিলান...। নির্জন সৈকতে একলা এমন দাঁড়িয়ে মনে হয় যুগ কে যুগ কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব।

অনেকটা সময় পর সাগরের নিবিড় সান্নিধ্য কাটিয়ে উঠে আসলাম। কিছু শৌখিন ঘোড়সওয়ার সৈকত দাপানো শুরু করেছে। সাত সকালে আগেভাগে দু'পয়সা কামাতে ক'টি উটের মালিকও হাযির। তাদেরকে পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে সৈকত পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠি। সিএনজি নিয়ে জামে'আ রহমানিয়াতে ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে গেল। গেটে নামতেই আমীরুল ভাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি? আমরা তো চিন্তায় পড়ে গেছি। পার্শ্বের পুলিশ স্টেশনে পর্যন্ত খবর দিয়ে এসেছি।' আসলে মোবাইলে চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় বিপদটা হয়েছিল। ফলে কারো সাথে যোগাযোগও করতে পারিনি, আর ঘড়ির কাটাও যে এতটা অতিক্রম করেছে টের পাইনি।

একটু পরই আল্লামা বিন্নৌরী টাউনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সোলযার বাযার থেকে সামান্য দেড়/দুই কিলোমিটারের দূরত্ব। ১৯৫৪ সালে এখানে 'জামে'আতুল উলূম আল-ইসলামিয়া' মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম তিরমিযীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মা'আরিফুস সুনান'-এর রচয়িতা আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (১৯০৮-১৯৭৭)। পাকিস্তানে দেওবন্দী মাসলাকের মাদরাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মাদরাসাটি। প্রায় বার হাযার ছাত্র এখানে পড়াশোনা করে। মূল ভবনটি মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই মসজিদের চমৎকার দু'টি মিনার, ভবনের সদর দরজা এবং অভ্যন্তরের সুদৃশ্য ফটক মাদ্রাসার বিশেষ আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছে। ২০০১ সালের পূর্বে বহু দেশের ছাত্র এখানে পড়তে আসত। বাংলাদেশেরও অনেক ছাত্র ছিল তখন। আমার নিজের মামা বাংলাদেশে তাবলীগ জামা'আতের একজন নেতৃপর্যায়ের আলেম মাওলানা সলীমুল্লাহ এখানে পড়াশোনা করেছিলেন। এছাড়া জামায়াত ইসলামীর নেতা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীও একসময় এখানকার ছাত্র ছিলেন। পূর্বে জায়গাটির নাম নিউটাউন ছিল। পরে আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরীর সম্মানে বিন্নৌরী টাউন নামকরণ করা হয়েছে।

ভিতরে ঢুকলাম। জুমআ'র দিন হওয়ায় ক্লাস নেই, শিক্ষকদেরও পাওয়া গেল না। ছাত্ররা মসজিদের ভিতরে এবং বাইরের খোলা চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুতালা'আ কিংবা গল্প-গুজবে ব্যস্ত। জনৈক বালতিস্তানী ছাত্র আকরামের সাথে পরিচয় হল। তার সাথেই মাদরাসাটা ঘুরে দেখলাম। প্রথমেই মাদরাসার এক কোণে মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরীর কবর যিয়ারত করলাম। ভাল লাগল ইমারতবিহীন মাটির অনাড়ম্বর কবরটা দেখে। সেখান থেকে ফিরে বুখারীর ক্লাসে ঢুকলাম। বিশাল ক্লাসরুমে খুব ঘন করে বেঞ্চ বসানো। অন্ততঃ চার-পাঁচশত ছাত্র বসতে পারে। এমনিতে অবশ্য ক্লাসরুম নেই বললেই চলে। সাধারণত ক্লাস হয় মসজিদেই। ছুটির দিন বলে লাইব্রেরীটা খোলা পেলাম না। আবাসিকতার অব্যবস্থাপনা বেশ চোখে পড়ার মত। আবাসিক রুমগুলোতে গাদাগাদি করে ছাত্ররা থাকে। এমনকি মাদরাসার বারান্দাতে পর্দা টাঙিয়ে সারি সারি বিছানা ফেলানো দেখলাম। মাদরাসা ক্যাম্পাসের বাইরে অবশ্য নতুন বিশাল একটি বিল্ডিং নির্মিত হচ্ছে। এটির নির্মাণকাজ শেষ হলে হয়ত আবাসিকতার সমস্যা দূর হবে। যে বিষয়টি দুঃখজনক, যত জন ছাত্রের সাথে কথা বললাম সর্বোচ্চ ক্লাসের ছাত্র হলেও তাদের কাউকে আরবীতে কথা বলায় তেমন পারদর্শী পেলাম না। একজন ছাত্র স্বীকার করল, আমাদের এখানে আরবীর কথোপকথনের চর্চা তেমন নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার জামে'আ রহমানিয়াতে ফিরে আসলাম।

জুম'আর ছালাত পড়ার জন্য রওয়ানা হলাম ফয়ছাল এভেনিউয়ে অবস্থিত বালুচ কলোনীর জামে মসজিদ ছিদ্দীকের উদ্দেশ্যে। প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম মাওলানা তাক্বী ওছমানীর মাদরাসা দারুল উলূম করাচী যাওয়ার পথেই মসজিদটি পড়ে। এজন্য আমীরুল ভাই এখানে নিয়ে এলেন। টিপু সুলতান ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে মোড় নিয়ে সামান্য ভিতরে ঢুকলেই নযরে আসে খুব সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে ৩ তলা মসজিদ। বেশী দিন হয়নি নির্মিত হয়েছে। মাওলানা আব্দুল হান্নানের সাথে দ্বিতীয়বারের মত দেখা হল এখানে। উনিই এই মসজিদের খত্বীব। এমনিতে স্বল্পভাষী হলেও বক্তব্য যথেষ্ট বাগ্মীতার আভাষ পাওয়া গেল। জুম'আর ছালাত শেষে বের হবার সময় বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে কুলাকুলি করলেন। এনারা সবাই গতরাতে কোর্টরোড মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদ থেকে বের হয়ে মালির রোড ধরে রওয়ানা হলাম কৌরঙ্গী টাউনের উদ্দেশ্যে। মাঝখানে শীর্ণ ধারার মালীর নদীটা পার হতে হয়। তারপর কৌরঙ্গী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মধ্য দিয়ে অনেকটা ভিতরে ঢুকে ২৮নং সেক্টরে বিশালায়তন দারুল উলূম করাচীর গেটে পৌঁছলাম। জুম'আর দিন বলে রাস্তাঘাট বেশ শুনশান। সুদৃশ্য ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ক্যাম্পাস। এটা যে একটি মাদরাসা, তা বোঝার কোন উপায় নেই। কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এমন চমৎকার ক্যাম্পাস কল্পনা করাই শক্ত। সুরম্য বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, বিভিন্ন দফতর, বিশাল মসজিদ, চওড়া রাস্তার উপর বাহারী নিয়নবাতি, দু'ধারে পাম আর সযত্নে ছেটে রাখা ঝাউগাছের সারি–সবমিলিয়ে শুরুতেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো এত সুন্দর মাদরাসা উপমহাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। সেই মুগ্ধতা নিয়েই ভিতরে ঢুকলাম মটরসাইকেল নিয়ে। সদর দফতরে ঢুকে একজন কর্মচারীকে পাওয়া গেল। উনার কাছে মাদরাসার সিলেবাস, প্রস্পেকটাস এবং এখান থেকে প্রকাশিত 'আল-বালাগ' পত্রিকাটি চাইলাম। কিন্তু উনি বললেন, এ মুহূর্তে দেয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার সব অফিস বন্ধ। আপনারা বিকালে আসেন। শায়খ রফী উছমানী এবং শায়খ তাক্বী উছমানী আছেন কি-না জানতে চাইলে উনি বললেন, উনারা আছেন বাসাতেই। আছরের সময় মসজিদে আসলে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

শায়খ রফী উছমানী (৭২) এবং শায়খ তাক্বী উছমানী (৬৯) দু'জনই পাকিস্তানের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী এবং 'তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে'র খ্যাতনামা রচয়িতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬ ইং)-এর সন্তান। ১৯৭৪ সালে পিতার মৃত্যুর পর থেকে অদ্যবধি শায়খ রফী উছমানী পাকিস্তানের গ্রাণ্ড মুফতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জামে'আ দারুল উলূম করাচীর প্রধানও। তবে কর্মজগতে তাঁর চেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁর ছোটভাই শায়খ তাক্বী উছমানী। বহুমুখী কর্মতৎপরতার কারণে তিনি কেবল পাকিস্তানেই নয় বরং সারাবিশ্বেই বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন হিসাবে একটি সুপরিচিত। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল শরী'আহ আদালতের বিচারক ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের শরী'আ এ্যাপিলেট বেঞ্চের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সুপ্রীম কোর্টে নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন, যা সংসদে প্রস্তাবিত যে কোন বিল শারঈ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কি-না তা পরীক্ষা করা এবং বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। সেই প্রস্তাবনা মোতাবেক ১৯৭৭ সালে জেনারেল যিয়াউল হক একটি সাংবিধানিক কমিটি হিসাবে 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' (সিআইআই) গঠন করেন, যেটি অদ্যবধি কার্যকর রয়েছে। তিনি ছিলেন এই কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইংরেজী, আরবী এবং উর্দূতে তাঁর এ বিষয়ক লেখালেখি প্রচুর। দেশ-বিদেশে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে তিনি দেশ-বিদেশের প্রায় ১৫টি ব্যাংকে শরী'আহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনীতি থেকে সযত্নে দূরে অবস্থান করলেও জাতীয় প্রয়োজনে তিনি কখনও কখনও রাজনীতি নিয়ে কথা বলে থাকেন। সর্বপ্রথম তিনি লাইম লাইটে আসেন ১৯৭৪ সালে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলনে সফলভাবে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে। পরবর্তীতে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় সহযোগিতা করার জন্য পারভেজ মোশাররফ সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে তাঁর সরব পদচারণা পাকিস্তানসহ বহির্বিশ্বে তাঁর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতার আসন পাকাপোক্ত করেছে।

পাকিস্তানে দেওবন্দী মাসলাকের এই বৃহত্তম মাদরাসাটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)। ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে শায়খ রফী উছমানী মাদরাসাটির মুদীর এবং শায়খ তাক্বী উছমানী নায়েবে মুদীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দু'ভাইয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় মাদরাসাটি উপমহাদেশে হানাফী দেওবন্দী মাসলাকের অন্যতম আঁকরভূমিতে পরিণত হয়েছে। উন্নত অবকাঠামো এবং লেখাপড়ার আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি মাদরাসাটিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

সুরম্য একাডেমিক বিল্ডিংগুলোতে ঢুকে বার বার বিস্মিত হবার পালা আসল। বিশেষ করে বুখারীর ক্লাস এবং ইফতার ক্লাস দেখে তো চোখ কপালে। উঁচু ছাদবিশিষ্ট বিরাট হল রুম। নীচে শিক্ষক মহোদয়ের বসার স্টেজটি বিচারকের মঞ্চের মতই সম্ভ্রম জাগানিয়া। উপরে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া মার্বেলপাথরে মোড়ানো বৃত্তাকার দীর্ঘ গ্যালারি। তাতে চওড়া টুল স্থাপন করা। ছাত্ররা ক্লাস করে ফ্লোরে বসেই। প্রত্যেকের সামনে আবার ডেস্ক মাইক। উন্নত সাউন্ড ও লাইটিং সিস্টেম। এতটা বিস্ময়ের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

অবশ্য ছাত্রদের সাথে কথা বলে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আরবী বাক্যালাপে এখানকার ছাত্রদের মধ্যেও বেশ দুর্বলতা টের পেলাম। পড়াশোনার মানের কথা জিজ্ঞেস করতে বেশ কয়েকজন মন্তব্য করল এখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হলেও পড়াশোনার দিক থেকে বিন্নোরী টাউন মাদরাসাই ভাল। এখানে বর্তমানে ফিক্বহ, দাওয়াহ এবং ক্বিরাআতে তাখাছছুছ (মাস্টার্স সমমান) করানো হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে হাদীছের উপর কোন তাখাছছুছ কোর্স নেই। কেউ হাদীছে তাখাছছুছ করতে চাইলে তাকে বিন্নোরী টাউন মাদরাসায় যেতে হয়।

সেখান থেকে বেরিয়ে মাদরাসার পূর্বকোণে শায়খ রফী উছমানী এবং তাক্বী উছমানীর বাসার সামনে আসলাম। পাশাপাশি প্রাচীর ঘেরা সুন্দর দু'টি দোতলা বাড়ি। নানা প্রজাতির মনোরম ফুল গাছ, পামের সারি আর লতানো অর্কিডে ভরা চারিপাশ। সামনে ছোট্ট চিড়িয়াখানার মত খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ুরসহ নানাজাতের পাখি। যথেষ্ট রুচিশীলতার ছাপ স্পষ্ট। আরো পিছনে শিক্ষক ও স্টাফদের কোয়ার্টার। সেগুলোও বেশ সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো।

মসজিদের সামনে আসলাম। জায়গাটা ক্যাম্পাসের মাঝামাঝি। প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যরীতির মিশেলে নির্মিত হয়েছে এই বিশাল মসজিদ। নির্মাণাধীন রয়েছে সুউচ্চ মিনারটি। ভিতরে ঢুকলাম। মাসজিদুল হারামের অনুকরণে প্রতিটি গেটের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া। আমরা ঢুকলাম বাবুল উছমানী গেট দিয়ে। একটাই ফ্লোর। মযবুত কাঠামোর উপর অনেক উঁচু ছাদ আর চারপাশে ঝুলন্ত বারান্দা। মাঝে বড় বড় ঝাড়বাতি। সুদৃশ্য কারুকাজ চারিদিকে। সময়ের স্বল্পতায় পুরোটা ঘুরে দেখা গেল না। বেরিয়ে এসে মসজিদের দক্ষিণদিকের কবরস্থানটায় চলে

আসলাম। এখানেই শুয়ে আছেন মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)। একদম সাদামাটা কবর। পাশাপাশি সার বেঁধে আরো অনেক কবর। কোনটাই বাঁধানো বা ঘেরাও করা নেই। কেবল ছোট্ট নামফলক রয়েছে। কবরকেন্দ্রিক বিদ'আত থেকে কর্তৃপক্ষের এই সচেতনতা দেখে খুব ভাল লাগল। কবর যিয়ারত করার পর ফিরে আসার পথে মাদরাসার আবাসিক ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য চারতলা বিশিষ্ট ভবনগুলোর একটিতে ঢুকলাম। যথারীতি সিক্যুরিটি গার্ডের মুখোমুখি হতে হয়। অনুমতি নিয়ে রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয় হলের আদলে সব সুযোগ-সুবিধাই আছে। বেশ বড় আকারের রুমে ৪/৫ জনের থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেকের জন্য টেবিল এবং আলমারী। যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দুপুরে ঘুমের সময় হওয়ায় ছাত্রদের সাথে কথা বলতে পারলাম না।

আছরের পর শায়খ নাছের রহমানী আসবেন, এই হিসাব করে দ্রুত বেরিয়ে আসলাম জামে'আ থেকে। নতুবা শায়খ তাক্বী ওছমানীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগটা না নিয়ে আসতাম না। বের হওয়ার সময় আমীরুল ভাই বললেন, পার্শ্বেই একটি বাঙালী পাড়া রয়েছে। কিছুক্ষণ সময় আছে দেখে সেদিকে যেতে চাইলাম। গলিপথে মিনিট দশেক ভিতরে ঢোকার পর আবিষ্কার করলাম কাঁচা-পাকা ঘিঞ্জি বাড়িঘরে ভর্তি বাঙালী পাড়া।

বাংলাদেশের বিহারীদের মত এরাও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালী। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তাদের পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন। তবে শুধু আটকে পড়া নয়, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপরই মুসলিম লীগপন্থীদের একটা অংশ এবং ৮০ এবং ৯০-এর দশকে আরও বহু বাঙালী এদেশে এসেছে জীবিকার তাগিদে। কিন্তু পরবর্তীতে আর বাংলাদেশে ফিরতে পারে নি বা ইচ্ছাকৃতভাবে ফিরে যায়নি। এদের সংখ্যা সরকারী হিসাবে এগারো লাখ বলা হলেও বাস্তবে নাকি প্রায় বিশ থেকে তিরিশ লাখ। তাদের প্রায় সকলেরই আবাস এই সমুদ্র উপকূলবর্তী করাচী শহর ঘিরে। অর্থাৎ করাচীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%ই বাঙালী। এদের বিরাট একটা অংশ আবার 'পাকিস্তানী নাগরিক' হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি অবৈধভাবে পাকিস্তানে ঢোকার দায়ে। ফলে তারা বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না এবং নাগরিক কোন সুযোগ-সুবিধাও পায় না। এমনকি তাদের সন্তানরা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করলেও তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হয় না। করাচীর সবচেয়ে দরিদ্র এলাকাগুলোতে বসবাস করে এই বাঙালীরা। করাচীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে ১১৬টি বাঙালী পল্লী। মৎস আহরণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাই এদের আয়ের প্রধান উৎস। তবে সম্পদশালী বাঙালী পরিবারও আছে বেশ কিছু, যারা শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে বাস করেন। ২০০০ সালে পাকিস্তান সরকার National Alien Registration Authority (NARA) গঠন করে অবৈধ ইমিগ্রান্টদেরকে নিবন্ধিত করার জন্য। এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় ১৯৭৪ সালের পূর্বে আগত বাংলাদেশীদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হবে। আর ১৯৭৪ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আগতদেরকে নাগরিকত্বের পরিবর্তে অস্থায়ী আবাসিকতা এবং কাজের অনুমতি দেয়া হবে। সেই মোতাবেক ২০১০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৫৩০০০ ব্যক্তিকে নিবন্ধনভুক্ত করা হয়েছে এবং এখনও কাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্যের কারণে সেই অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করাও এক বিরাট ঝক্কির কাজ। সবমিলিয়ে এক স্বপ্নহীন মানবেতর জীবন যাপন করছে তারা। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তাদের অধিকাংশই নেতিবাচক জবাব দেবে। কেন তারা বাংলাদেশে ফিরতে চায় না এই প্রশ্নের জবাব তাদের নিজেদের কাছেও যেন স্পষ্ট নয়। অনেকক্ষণ ভাবার পর একেকজন একেকভাবে উত্তর দেয়। বাংলাদেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে চলতেই যেন তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এত কিছু সত্ত্বেও দেশের প্রতি যে তাদের টান আছে সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেট টীম যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে তখন বোঝা যায়।

করাচী আসার আগে পাকিস্তানের অভিবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে ইন্টারনেট ঘেটে এসব তথ্যই পেয়েছিলাম। এজন্য এদের সাথে সরাসরি কথা বলার খুব আগ্রহ ছিল। অপ্রশস্ত ভাঙাচোরা গলিপথে বেশ অনেকটা ঢোকার পর মাছের বাজারে ঢুকলাম। সামুদ্রিক মাছই বেশী। তবে দেশী মাছও কিছু পাওয়া যায়। আমীরুল ভাই তেলাপিয়া মাছ কিনছিলেন। সেই ফাঁকে আমি পার্শ্ববর্তী দোকানীদের সাথে কথা বলার জন্য গেলাম। এক বয়স্ক সাদা দাড়ীওয়ালা মুরব্বী মুদী দোকানীকে সালাম দিয়ে বাংলায় নিজের পরিচয় দিলাম। উনি আমাকে এক পলক দেখে সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ পেল না। প্রথমে বাংলায় কথা বলতে এমনকি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেও অনাগ্রহ বোধ করছিলেন। শেষতক পীড়াপীড়ি করার পর জানালেন বাংলাদেশে তার বাড়ী বরিশালে। আশির দশকে এসেছেন এ দেশে সপরিবারে এবং খুব ভাল আছেন। কোন সমস্যা বোধ করেন না। টানা টানা ছাফ জবাব। পাশের এক মধ্যবয়সী পান দোকানীর দিকে এগিয়ে গেলাম। তারও অবস্থা প্রায় একই রকম। চট্টগ্রামে বাড়ী। জানালেন, কিছুদিন আগেই বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসেছেন আত্মীয়-পরিজনের সাথে দেখা করে। নাগরিকত্ব পেয়েছেন এখানকার। আয়-ইনকাম ভালই হয়। কোন সমস্যা নেই। বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাযী নন।

হতাশ হলাম। বুঝতে পারলাম প্রাপ্ত তথ্যে খুব একটা ভুল নেই। আত্মপরিচয়, স্বদেশ এই শিকড়ছিন্ন মানুষগুলোর কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কেন নয়, সেটাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। কেন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয় আর জড়তার অদৃশ্য ঘেরাটোপে তারা বন্দী, তা বুঝতে কিছুদিন কাটাতে হবে তাদের সাথে।

ফেরার সময় পাড়ার মধ্যেই এক ছোট্ট বাঙালী হোটেলে ঢুকলাম মাছ খাওয়ার জন্য। অল্প বয়স্ক বিক্রেতা দু'জনের চেহারা দেখে বোঝা গেল এরা আরাকানী। ফলে বাঙালী পরিচয় দেয়ার পরও ওদের মধ্যে তেমন ভাবান্তর দেখা গেল না। ওরা জানালো ওদের জন্ম এ দেশেই। বাংলা অল্পবিস্তর জানলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় খেলাধুলা করতে থাকা ছোট বাচ্চাদের বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, ..কেমন আছ? ..নাম কি? ওরা উত্তর না দিয়ে কিছু সময় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে ভো দৌড়। জানা হ'ল না ওরা বাংলা জানে কি-না।

আছরের পূর্বেই পৌঁছলাম মাদরাসায়। ছালাতের পর দাউদ ছাহেবের ফোন আসল আবার। শায়খ আসতে পারছেন না। বার বার এমনটি করার রহস্য বুঝতে পারলাম না। সুতরাং খানিকটা বিরক্তি নিয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। সময়টা কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল, কিন্তু এমন দোটানায় পড়ে কিছুই আর হল না। রাতটা কাটালাম মাদরাসাতেই।

পরদিন সকালে ইসলামাবাদগামী তেজগাম এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট না পেয়ে ডেভ্যু বাস সার্ভিসে টিকেট কাটলাম। রাত দশটায় বাস। তাই সকালে আমীরুল ভাইয়ের দুই ছেলে মুনীফ ও আব্দুর রহমানকে নিয়ে করাচী চিড়িয়াখানায় গেলাম। আয়তনে বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। সবুজের সমারোহ চোখে পড়ার মত। ভাল সময় কাটল সেখানে। বিশেষ করে দুই পিচ্চির তো আনন্দ ধরে না। ইচ্ছামত এটা-সেটা আবদার করার মত একজন মামা পেয়ে ওদের পোয়াবারো। ঘুরতে ঘুরতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচার সামনে আসলাম। স্বদেশী বাঘটাকে পেয়ে খুব আপন আপন লাগল। মুনীফ, আব্দুর রহমানকেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওরা বাংলাদেশ থেকে আগত বাঘ শুনে মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল।

চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ'র মাযারে গেলাম। মাযারসংলগ্ন পার্ক এলাকাটি ৬০ একর জায়গার উপর তৈরী করা হয়েছে। প্রাচীরঘেরা খোলা প্রান্তরের মাঝখানে মাযার। উপরে গোলাকৃতির ডোম। চারিপাশে মার্বেল পাথরের উন্মুক্ত বিশাল চত্বর। যথেষ্ট ভীড় দর্শনার্থীদের। মাযারের ভিতর কবরটা শ্বেতপাথরে নির্মিত। মাথার দিকটায় উর্দূ এবং বাংলাতে জন্ম-মৃত্যু তারিখ লেখা। বাংলা লিপি দেখে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম। চোখ কচলে আবার দেখলাম। ঠিকই দেখেছি, বাংলাতে লেখা। মনে মনে হাসলাম, এমন একজন ব্যক্তি যাকে বাংলাভাষার শত্রু হিসাবে দেখা হয়, স্বয়ং তাঁর কবরেই কিনা বাংলা হরফ! এ কেমন পরিহাস!

পাকিস্তানে দল-মত নির্বিশেষে সকলের কাছে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ'র অবস্থান অত্যন্ত মযবুত। কি ইসলামপন্থী কি ইসলামবিরোধী, সকলেই তাঁকে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমন তর্কাতীত, অবিসংবাদিত অবস্থানে পৌঁছতে পারাটা একজন জাতীয় নেতার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। নিজগুণেই তিনি এই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন। মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওছমানীকে নাকি একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনারা এত বড় আলেম-ওলামা থাকা সত্ত্বেও এমন এক দাড়িমুন্ডা লোককে কেন নেতা হিসাবে মেনে নিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'এই লোকটার অনেক সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর দু'টি চারিত্রিক গুণ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। তা হল, 'তিনি 'ছাদেক ও আমীন' অর্থাৎ অকপট সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। এ কারণেই তিনি জাতীয় নেতা হয়েছেন'। আসলেই আজকের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে এই দু'টি জিনিসের অভাবই সবচেয়ে প্রকট।

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার মাদরাসায় আসলাম। রাতে আমীরুল ভাইয়ের বাসায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেভ্যু স্টান্ডে আসলাম। আমীরুল ভাইয়ের দুই ছেলে করুণ চেহারা নিয়ে বার বার জিজ্ঞেস করে আবার কবে আসব। মুনীফ তো কাঁদ কাঁদ স্বরে ওর আব্বাকে বলেই ফেলল, আমি করাচী আর থাকব না, ইসলামাবাদে পড়াশোনা করব, ওখানে মামার কাছে থাকব। ওদেরকে বিদায় দিয়ে বাসে উঠলাম। রাত ১০টায় বাস ছাড়ল। ২৪ ঘণ্টার লম্বা জার্নি। নড়ে চড়ে বসতে না বসতেই ঘণ্টা দুই পর হায়দারাবাদে এসে বাস থামে। প্রতি দু'আড়াই ঘণ্টা বাদে এই কোম্পানীর বাসগুলো নিজস্ব কাউন্টারগুলোতে থেমে ড্রাইভার চেঞ্জ করে এবং গাড়ীর সিস্টেমেটিক চেকআপও সেরে নেয়। নিরাপদ যাত্রা উপহার দেয়ার জন্যই এতসব নিয়ম। তারপর আবার যাত্রা শুরু হয়। রাত কাটিয়ে দিন, দিন কাটিয়ে আবার রাত হয় রাস্তার উপরই। পরদিন রাত দশটার দিকে মিয়াঁওয়ালী এসে গাড়ীর এসি বিকল হয়ে গেল। এত সতর্কতা, এত নিয়ম-কানূন সত্ত্বেও রেহাই পাওয়া পেল না বিপদ থেকে। অপর একটি গাড়ী নিয়ে আসল আরো ঘণ্টা দুই পর। ফলে ইসলামাবাদ পৌঁছতে রাত ৩টা বেজে গেল। ভোর ৪টার সময় ধুঁকতে ধুঁকতে হোস্টেলে এসে পৌঁছলাম দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টার জার্নি শেষে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

# লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

**-সহকারী সম্পাদক**

# আলোকপাত

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

***প্রশ্ন (০৩/০১) : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কী? ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাংঘর্ষিক দিকগুলো কী কী?***

*-মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম*
*সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, বাংলাক্যাট, ঢাকা।*

**উত্তর :** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সফিস্টদের চিন্তাধারায় এটি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। মূলকথা হল, ফরাসী বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করার মাধ্যমে আধুনিক যুগে পশ্চিম ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আবির্ভাব হয়। এভাবে এর মূল প্রবক্তা ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪ খৃঃ) ১৯ শতকের মাঝামাঝিতে এটাকে বিশেষ মতবাদ হিসাবে রূপ দান করেন। তিনি ধর্ম ও আল্লাহ্র বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে উক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেমে পড়েন।

Secularism ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal) ইত্যাদি। মূলতঃ এর অর্থ হল ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পরজীবন বিমুখ। তাই এর অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়; বরং ধর্মহীনতাবাদ, বৈষয়িকতাবাদ। কারণ মানুষকে ধর্মহীন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

চেম্বারস ডিকশনারীর মতে, The belief that the state morals, education should be independent of religion. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস, যার মতে রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা সবকিছুই ধর্মমুক্ত থাকবে'। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Secularism means the doctrin that morality should be based solely on regard to the well being of mankind in the present life to the exclusin of all consideration drawn from belief in God or in future state. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ, যা মনে করে আল্লাহ বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানব জাতির কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে'।

Encyclopedia of britanica-তে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from the worldliness to life on earth ... 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়'। উক্ত মতবাদের মূল শ্লোগান হল, Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. অর্থাৎ 'ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।

**ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :**

(ক) ইসলামের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত দ্বীনদার বানানো। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মহীন দুনিয়াদার বানানো।

(খ) ইসলাম মানুষকে দ্বীনী অনুশাসনের মাধ্যমে আল্লাহ্র গোলামে পরিণত করে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানবরূপী পশুতে পরিণত করে *(আ'রাফ ১৭৯)*।

(গ) ইসলামের ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত অহি। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নাস্তিক্যবাদ।

(ঘ) ইসলামী জীবন সুশৃংখল এবং সমুন্নত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও বল্গাহীন।

(ঙ) ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার।

***প্রশ্ন (০৩/০২) : ফিলিস্তীনের 'হামাস' ও 'ফাতাহ' সম্পর্কে জানতে চাই?***

*-আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক*
*পাঁচদোনা, নরসিংদী।*

**উত্তর :** আরবী 'হামাস' শব্দের অর্থ 'উৎসাহ'। আবার আরবী ভাষায় 'ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন'-এর প্রথম অক্ষরগুলোর সম্মিলিত রূপও 'হামাস'। ১৯৮৭ সালে গাযার শেখ আহমাদ ইয়াসিন হামাস-এর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক ও সামরিক শাখা সংবলিত এই সংস্থাটি আসলে আশির দশকের ইনতিফাদা বা ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানেরই বর্তমান সংগঠিত রূপ। ইয়াসির আরাফাতের আপোসবাদিতা এবং ইসরাঈল-প্যালেস্টাইন শান্তিপ্রক্রিয়ার বিরোধী হামাস-এর লক্ষ্য প্যালেস্টাইন ইরানী মডেলের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর অপর প্রেরণার উৎস মিশরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'। হামাস ইয়াসির আরাফাতের ভূমিকাকে ইহূদীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ বলে মনে করে এবং জঙ্গী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌম প্যালেস্টাইন কায়েম সম্ভব বলে বিবেচনা করে।

পক্ষান্তরে ইহূদীদের কবল থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে ইয়াসির আরাফাত নামের এক তরুণ প্রকৌশলীর নেতৃত্বে 'ফাতাহ' নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে 'ফাতাহ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (পি. এল. ও) নামক যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীকদল হিসাবে যোগদান করে। পি. এল. ও-র শরীকদলের মধ্যে 'ফাতাহ'ই বৃহত্তম এবং এই সুবাদে এর নেতা ইয়াসির আরাফাতই পি. এল. ও-এর প্রধান নেতা। পরবর্তীকালে ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে মতভেদের কারণে কিছুসংখ্যক সদস্য 'ফাতাহ' থেকে বেরিয়ে গেলেও 'ফাতাহ'ই প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামে বৃহত্তম হিসাবে বহাল থাকে *(দ্র. রাজনীতিকোষ)*।

***প্রশ্ন (০৩/০৩) : চার খলীফার খেলাফতকাল জানতে চাই?***

*-আব্দুল্লাহ আল-মামুন*
*নীলফামারী।*

**উত্তর :** চার খলীফার সর্বমোট খেলাফতকাল ৩০ বছর। নিম্নে পর্যায়ক্রমে সাল উল্লেখ করা হল- (ক) আবুবকর (রাঃ)-এর আড়াই বছর খেলাফতকাল, ১১ হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩ হিজরী মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ। (খ) ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতাকাল দশ বছর, ১৩ হিজরী মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৩ হিজরী মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। (গ) ওছমান (রাঃ)-এর বার বছর খেলাফতকাল, ২৩ হিজরী মোতাবেক ৬৪৪

খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩৫ হিজরী মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং (ঘ) আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকাল ছয় বছর, ৩৫ হিজরী মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৪০ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

***প্রশ্ন (০৩/০৪) : কুতুবে সিত্তাহ কত সালে সংকলিত হয়? সব হাদীছের গ্রন্থ কী ছহীহ? 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে কী?***

*-আশরাফুল আলম*
*মনিরামপুর, যশোর।*

**উত্তর :** তৃতীয় শতাব্দী হিজরীকে হাদীছ সংকলনের 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। কেননা এ যুগেই কুতুবে সিত্তাহ তথা হাদীছের বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়। সেগুলো হল, ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান আবুদাঊদ, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইবনু মাজাহ। উপরোক্ত হাদীছগ্রন্থগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম বিশুদ্ধ রেওয়াতভিত্তিক হাদীছ গ্রন্থ। বাকী চারটি গ্রন্থ ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছ মিশ্রিত। যদিও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত যঈফ ও জাল হাদীছগুলোকে পৃথক করেছেন। উল্লেখ্য যে, সুনান আবুদাঊদে শুধুমাত্র যঈফ হাদীছ আছে কিন্তু জাল বা বানোয়াট হাদীছ নেই। তাই উক্ত গ্রন্থগুলোকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' নয়; বরং 'কুতুবে সিত্তাহ' বলতে হবে।

***প্রশ্ন (০৩/০৫) : ঈসা (আঃ) বনু ইসরাঈলদের নিকট কয়টি নিদর্শন প্রদর্শন করেছিলেন এবং তা কী কী?***

*-সাখাওয়াত হোসাইন*
*চককাযিযিয়া, তানোর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে ঈসা (আঃ) বনু ইসরাঈলদেরকে তাঁর আনীত পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করেন। যথা : (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্র হুকুমে। (২) আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে (৪) আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে (৫) আমি তোমাদের বলে দেই, যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*। এটি ছিল ঈসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত মু'জেযা।

***প্রশ্ন (০৩/০৬) : মক্কা ঘোষণা বলতে কী বুঝানো হয়?***

*-আসাদুযযামান*
*কেশবপুর, যশোর।*

**উত্তর :** ১৯৮১ সালের ২৫-২৮ জানুয়ারী মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ৪০টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানগণ এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণায় যে সমস্ত বিষয় সংযুক্ত করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ : নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য, ভাষা, বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলিম যে একটি এক ও অখণ্ড জাতি, মুসলিমদের হারানো ভূ-ভণ্ড উদ্ধার, পবিত্র স্থানসমূহ মুক্ত করার জিহাদে সর্বশক্তি প্রয়োগ, আফগান জনগণের সঙ্গে একাত্মতা, উপসাগরীয় দেশসমূহের বাইরের হস্তক্ষেপ যে অবাঞ্ছিত, গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, শক্তির দাপট, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অবিচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনার কবলমুক্ত নতুন বিশ্ব গঠন; তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের প্রতি সংহতি, মুসলিম দেশসমূহের সকল সম্পদ সমন্বিতকরণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা, শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী নীতি আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞান-কলাকৌশল ইত্যাদির সংযোজন, ইসলামী ঐক্যসংস্থাকে আরো কার্যকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে থাকার তাওফীক্ব দানের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্র প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়। উল্লেখ্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ইরান এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিল।

***প্রশ্ন (০৩/০৭) : খারেজী মতবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ জানতে চাই?***

*-তানভীর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** খারেজী মতবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। ফের্কাবন্দীর ইতিহাসে প্রধান ভ্রান্ত ফের্কা হল খারেজী। নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের মূল টার্গেট ছিল যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা। রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পূর্বমুহূর্তে উক্ত মতবাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার মাধ্যমে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। সর্বশেষে চতুর্থ খলীফা আলী (আঃ)-কে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা হলেও খারেজীরা আড়ালেই থেকে যায়। অতঃপর আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন সাবার ইহূদী জোট মুসলিমদের অভ্যন্তরে থেকেই তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাবহ রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩৬ হিজরীতে আলী ও আয়েশা (আঃ)-এর মাঝে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপ তাদেরই যোগসাজশে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ৩৭ হিজরীর ছফর মাসের ১ম তারিখে বুধবার ছিফফীনের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মূলতঃ এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

***প্রশ্ন (০৩/০৮) : আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কী?***

*-হাফীযুর রহমান*
*মানিকহার, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজা *(দ্র. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই)*।

***প্রশ্ন (০৩/০৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অহী প্রেরণের পদ্ধতি কয়টি ছিল ও কী কী?***

*-হাবীবুল্লাহ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

**উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছয়টি পদ্ধতিতে অহী প্রেরণ করেন। যেমন- (১) ঘণ্টার ধ্বনীর ন্যায় (২) ফেরেশতার মনুষ্য আকৃতিতে আগমন (৩) ফেরেশতার আপন আকৃতিতে আগমন (৪) সত্য স্বপ্ন (৫) আল্লাহ তা'আলা থেকে সরাসরি অহী লাভ (৬) অন্তরে নিক্ষেপ করে *(ছহীহ বুখারী ১/২ পৃঃ; মান্না' আল-ক্বাত্তান, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৩৯)*।

***প্রশ্ন (০৩/১০) : আশূরায়ে মুহাররমের ফযীলত ও করণীয় জানতে চাই?***

*-শু'আয়ব হুসাইন*
*খুলনা।*

**উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা আরবী বার মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সে চারটি মাস হল মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। অন্যভাবে বলা যায় যে, যুলক্বা'দাহ হতে মুহাররম পর্যন্ত একটানা তিন মাস। অতঃপর পাঁচ মাস বিরতি দিয়ে 'রজব' মাস। এভাবে বছরের এক তৃতীয়াংশ তথা 'চার মাস' হল 'হরম' বা সম্মানিত মাস। লড়াই, ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদী অন্যায়-অপকর্ম হতে দূরে থেকে এর

মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'এই মাসগুলোতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না' *(তওবা ৩৬)*। আশূরায়ে মুহাররমের অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হল রাতের নফল ছালাত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, আশূরার ছিয়াম আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। মূলতঃ আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দুদিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করণীয় নেই। এটিই একমাত্র করণীয় বিষয়, যা কেবলমাত্র ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়ার নিয়তে পালন করত হবে।

উল্লেখ্য, আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু তথা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। হুসাইন (রাঃ)-এর মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে জন্ম এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়। সুতরাং শাহাদতে হুসাইনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে নেকী পাওয়া যাবে না *('আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই দ্র.)*।

***প্রশ্ন (০৩/১১) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা দলীল সহ জানতে চাই?***

*মুহাম্মাদ রাসেল*
*নাটোর।*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল *(বুখারী হা/৩৮৭০)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, একদা মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দ্বিখণ্ডের মাঝে হিরা পাহাড়কে দেখতে পেয়েছিল *(বুখারী হা/৩৮৬৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মীনায় ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম চাঁদের একটি খণ্ড হেরা পাহাড়ের দিকে চলে গেল *(বুখারী হা/৩৮৬৯, 'চাঁদকে দুই খণ্ড করা' অনুচ্ছেদ-৩৬, অধ্যায়-৬৩)*।

***প্রশ্ন (০৩/১২) : ইউসুফ (আঃ)-এর ঘামের গন্ধে ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফেরার ঘটনাটির সত্যতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে চাই?***

*-আব্দুল্লাহ আল-মামুন*
*মানিকদিয়া, গাংনী, মেহেরপুর*

**উত্তর :** ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা প্রেরণ ও তা মুখের উপর রাখার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার বিষয়টির উপর বর্তমানে গবেষণা হয়েছে এবং দেখানে হয়েছে যে, মানবদেহের ঘামের মধ্যে এমন উপাদান আছে যার প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা সম্ভব। উক্ত গবেষণার মূল সূত্র ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কুরআনী বর্ণনা *(ইউসুফ ১২/৯৬)*।

**বৈজ্ঞানিক তথ্য :** সূরা ইউসুফের ৮৪ এবং ৯৩-৯৬ আয়াতগুলো গবেষণা করে মিসরের সরকারী 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চেস ইন ইজিপ্ট'-এর মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. আবদুল বাসিত মুহাম্মাদ মানুষের দেহের ঘাম থেকে একটি 'আইড্রপ' আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে ২৫০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৯০%-এর বেশী চোখের ছানি রোগ সেরে যায় ও তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ইতিমধ্যে এই ঔষধটি 'ইউরোপিয়ান ইন্টারন্যাশনাল প্যাটেন্ট ১৯৯১' এবং 'আমেরিকান প্যাটেন্ট ১৯৯৩' লাভ করেছে। এছাড়া একটি সুইস ঔষধ কোম্পানীর সাথে তাঁর চুক্তি হয়েছে এই মর্মে যে, তারা তাদের ঔষধের প্যাকেটের উপর 'মেডিসিন অফ কুরআন' লিখে তা বাজারে ছাড়বে *(ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী ১/২২৭ পৃঃ, ১৬৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)*।

***প্রশ্ন (০৩/১৩) : সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা কি? বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই?***

*-মেহেদী হাসান*
*কাকিলাদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া।*

**উত্তর :** ইয়াকূব (আঃ) কর্তৃক কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলো অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা সুলায়মান (আঃ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাহরে থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। আর এভাবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক আল্লাহ্র রাসূল সুলায়মান (আঃ) *(নবীদের কাহিনী ২/১৫৯-১৬০ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (০৩/১৪) : নূহ (আঃ)-এর ক্বওমের নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে কয়টি আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং কী কী?***

*-নূর আলম, নোয়াখালী।*

**উত্তর :** নূহ (আঃ)-এর ক্বওমের অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। যথা : (১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হলে তো ফেরেশতা হতেন। (২) আপনার অনুসারী হল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। (৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না *(হূদ ১১/২৭)*। (৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী। (৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলের ব্যাপারে এরকম আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমদে তা ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে যুগের পরম্পরায় হক্বপন্থী আলেমগণও বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়ে অকথ্য নির্যাতন-জেল-যুলুম সহ্য করেছেন। অবশেষে তারাই জগদ্বাসীর কাছে সম্মানিত হয়েছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

# সংগঠন সংবাদ

## কেন্দ্র সংবাদ

### ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ২০১৪-২০১৬ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ পুনর্গঠন

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮ ও ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১৪’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাম আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। উক্ত কাউন্সিল সম্মেলনে আমীরে জামা‘আত ২০১৪-২০১৬ শেসনের সভাপতি হিসাবে ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতারের নাম ঘোষণা করেন। অতঃপর ১৯ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাকী ১০ সদস্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা নিম্নরূপ :

| ক্রঃ নং | নাম | পদবী | যেলার নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | আব্দুর রশীদ আখতার | সভাপতি | মেহেরপুর | কামিল |
| ০২ | জামীলুর রহমান | সহ-সভাপতি | কুমিল্লা | কামিল |
| ০৩ | আরীফুল ইসলাম | সাধারণ সম্পাদক | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | এম.এ |
| ০৪ | মুস্তাক্বীম আহমাদ | সাংগঠনিক সম্পাদক | রাজশাহী | বি.এ |
| ০৫ | আব্দুর রাকীব | অর্থ সম্পাদক | সাতক্ষীরা | বি.এস.এস (অনার্স) |
| ০৬ | আব্দুল্লাহিল কাফী | প্রশিক্ষণ সম্পাদক | রাজশাহী | এম.এ |
| ০৭ | মুখতারুল ইসলাম | তাবলীগ সম্পাদক | রাজশাহী | এম.এ |
| ০৮ | আব্দুল্লাহ আল-মামুন | তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক | গাইবান্ধা | বি.এ অনার্স (২য় বর্ষ) |
| ০৯ | আবুল বাশার আব্দুল্লাহ | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | মেহেরপুর | কামিল |
| ১০ | কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন | সমাজকল্যাণ সম্পাদক | নরসিংদী | কামিল |
| ১১ | বেলাল হোসাইন | দফতর সম্পাদক | কুমিল্লা | এস.এস.সি |

### যেলা পুনর্গঠন

**নওদাপাড়া, রাজশাহী পশ্চিম, রাজশাহী ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার :** অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। পরিশেষে আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি, সাইফুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং রেযাউল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের রাজশাহী পশ্চিম যেলার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী পূর্ব, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী পূর্ব পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক দুরুল হূদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। পরিশেষে আব্দুর রহীমকে সভাপতি, আব্দুল্লাহিল কাফীকে সহ-সভাপতি এবং যিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের রাজশাহী পূর্ব যেলার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী মহানগর পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহানগর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মবিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। পরিশেষে আশীকুর রহমানকে সভাপতি, আবুল হোসাইনকে সহ-সভাপতি এবং নাযীদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী মহানগর ২০১৪-২০১৬ সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী কলেজ পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহানগর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মবিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। পরিশেষে রবীউল ইসলামকে সভাপতি, আব্দুল মান্নানকে সহ-সভাপতি এবং আজমাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী কলেজ ২০১৪-২০১৬ সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম‘আ নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘যুবসংঘ’-এর কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি হাশেমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে

মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব সবুজকে সভাপতি, মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম রাজিবকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ তুহিনকে সাধারণ সম্পাদক করে কুষ্টিয়া পূর্ব যেলার ২০১৪-২০১৬ সেশনের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**খোসাবাড়ি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ এনায়েতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ শামীম আহমাদকে সভাপতি, মাহমূদুল হাসানকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ ওয়াসিমকে সাধারণ সম্পাদক করে সিরাজগঞ্জ যেলার ২০১৪-২০১৬ সেশনের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১ অক্টোবর বুধবার :** অদ্য বাদ যোহর দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম। অতঃপর মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফারকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**বামুন্দি, মেহেরপুর ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বামুন্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুযযামান বাচ্চুসহ 'আন্দোলন'-এর যেলা কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ। পরিশেষ মনিরুল ইসলামকে সভাপতি, রেযাউর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং আওরঙ্গযেব স্বপনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**মইশালা, রাজবাড়ী ৪ অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ সকাল ১১.০০ টায় মইশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজবাড়ী যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মক্বুল হোসেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহসহ 'আন্দোলন'-এর যেলা কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ। পরিশেষ আব্দুল আওয়ালকে সভাপতি, জাহিদুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং যাকারিয়া খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য রাজবাড়ী সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৮ অক্টোবর বুধবার :** অদ্য বাদ সকাল ১১.০০ টায় ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকুব হোসাইন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে মিলন আখতারকে সভাপতি, বেলাল হোসেনকে সহ-সভাপতি এবং মনিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**লালবাগ-১, দিনাজপুর ১০ অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর লালবাগ-১ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আজমানুল হক্ব। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে ফরহাদুল ইসলামকে সভাপতি, আব্দুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং শফিকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**তাহেরপুর, জালিবাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০ অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯ ঘটিকায় তাহেরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ (উত্তর) যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে হাফেয মুহাম্মাদ রাজিবুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ মেহেদী হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য চাঁপাই নবাবগঞ্জ (উত্তর) সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**বোরচুনা, ঠাকুরগাঁও ১১ অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর বোরচুনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে হাফেয মুহাম্মাদ রাজিবুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলামকে সহ-

সভাপতি এবং মুহাম্মাদ মেহেদী হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**চাঁদপুর, দিনাজপুর ১২ অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বাদ যোহর চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর (পূর্ব) যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহহাব। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষ রামাযান আলীকে সভাপতি, যয়নাল আবেদীনকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**জয়রামপুর, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা ২১ অক্টোবর মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে ছালেহ আহমাদকে সভাপতি, হাবীবুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং ফায়ছাল কবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর ২৪ অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বযলুর রশীদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে তরীকুল ইসলামকে সভাপতি, হাফেয তরীকুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য যশোর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

**কালদিয়া, বাগেরহাট ২৫ অক্টোবর শনিবার :** অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় কালদিয়া দারুলহাদীছ মাদরাসা জামে মসজিদে বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক যেলা কমিটি পুনর্গঠনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। পরিশেষে মনিরুযযামানকে সভাপতি, আমিনুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং এমদাদুল হক্বকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৪-২০১৬ সেশনের জন্য যশোর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

## ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় মুযাফফর বিন মুহসিন গ্রেফতার

গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার বেলা আড়াইটায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মুযাফফর বিন মুহসিন ঢাকা থেকে গ্রেফতার হন। ঢাকার মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেওয়ার পর ছালাত শেষে বের হলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) দু'জন কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে আপোষে ডেকে নিয়ে যায়। অতঃপর ২ দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রাখে। বহু চেষ্টা করেও যখন কোন হদিছ পাওয়া যায়নি তখন ৯ নভেম্বর তাকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের হাতে সম্প্রতি নিহত 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন আসামী হিসাবে গ্রেফতার দেখায় এবং ঢাকার সিএমএম কোর্টে চালান করে। তারপর কতিপয় ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া তাকে ন্যাক্কারজনকভাবে তথাকথিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' সদস্য বলে ফলাও করে অপপ্রচার করে। অতঃপর পুলিশের পক্ষ থেকে ৫ দিনের রিমাণ্ড আবেদন করলে আদালত ২ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। অতঃপর রিমাণ্ড শেষে ১২ই নভেম্বর বুধবার তার জন্য যামিনের আবেদন করা হয়। কিন্তু পুলিশরা সেখানে পুনরায় ৫ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে। আদালত যামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় এবং কারাগেটে তিনদিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়। বর্তমানে তিনি গাজীপুরস্থ কাশিমপুর-১ কারাগারে অন্তরীণ রয়েছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমান মামলাটি সিএমএম আদালত থেকে জজকোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। তার যামিনের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।

*[আমরা তাকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে নিঃশর্তভাবে মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।-সহকারী সম্পাদক]*

### অনতিবিলম্বে মুযাফফর বিন মুহসিনকে মুক্তি দিন!

*-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

গত ৯ই নভেম্বর রবিবার নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেজনকভাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, মুযাফফর বিন মুহসিননে কথিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' সাথে জড়িয়ে পত্র-পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বরং যেকোন চরমপন্থার বিরুদ্ধেই তার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তিনি শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দুই দুইবারের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বর্তমানে সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'। 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' সাথে তার কোনরূপ দূরতম সংশ্লিষ্টতা নেই। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে গত শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকার মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডিবি পুলিশ নিয়ে যায়। অতঃপর দুদিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার দেখায়। তারা বর্তমানে সরকারের নিকট অনতিবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করেন।

তারা বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গুম-খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই এই সংগঠনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য'। *(দৈনিক ইনকিলাব ১০ই নভেম্বর'১৪ এবং দৈনিক প্রথম আলো ১১ই নভেম্বর'১৪-এ প্রকাশিত)।*

# প্রতিক্রিয়া

**(এক)**

ভাই মুযাফফর বিন মুহসিন। দু'দিন ধরে ডিবির কার্যালয়ে আটক থাকার পর আজ (৯ই নভেম্বর) অবশেষে তাকে আদালতে চালান দিয়েই বসল আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত, অথর্ব প্রশাসন। যথারীতি ৭ দিনের রিমাণ্ডও চাওয়া হল। সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আমাদের সাধারণ জনগণের আস্থার পারদ আরো এক দফা নিম্নমুখী হল। 'গুড গভর্নেন্স' একটি দেশের স্বার্থক রাষ্ট্র হয়ে উঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। অথচ এই মানদণ্ডে আমাদের সরকারগুলো সবচেয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে দিনের পর দিন। প্রশাসনযন্ত্রের কাজ-কারবার দেখলে মনে হয় স্রেফ বন-জঙ্গলে বসবাস করছি আমরা। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ যেন নেই এখানে। ২০০৫ সালে আমরা দেখেছিলাম কোন প্রকার ক্লু ছাড়াই পুরোপুরি ধাপ্পার উপর ভিত্তি করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রায় অর্ধশত নেতা কর্মীর উপর কারা নির্যাতন করা হয়েছিল। **প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মত একজন শ্রদ্ধেয় বিদ্বানকে পর্যন্ত রাতারাতি 'জঙ্গী' বানিয়ে একের পর এক আরব্য রজনীর কাহিনীর মত মিথ্যা রূপকথার মামলায় জড়ানো হল। তাও দু'এক মাসের জন্য নয়, তাঁকে জেলখানার চৌদ্দ শিকের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছর। ভাবা যায়! আমরা আমজনতা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করে বলি, 'সব সম্ভবের দেশ এই বাংলাদেশ'। আজও ঠিক একইভাবে মুযাফফর ভাইকে এক ফালতু অভিযোগে আটক করা হয়েছে। সূত্র হল, কোন একদিন তার খুৎবায় নিহত টিভি আলোচক নূরুল ইসলাম ফারূকীর কোন শিরকী কার্যকলাপের প্রতিবাদে কিছু কথা বলেছিলেন, যা ফেসবুকে ক্লিপ আকারে কিছু ভাই শেয়ার করেছিলেন। ব্যাস! এইটুকুতেই আমাদের করিৎকর্মা প্রশাসন নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যাকাণ্ডের সাথে তার মহাসম্পর্ক আবিষ্কার করে বসল, অপরাধ নির্ণয়ে কোন প্রমাণপঞ্জি, কোন আইন-বিচারের ধারা অনুসরণ করার দরকার নেই! শুধু তাই নয়, দু'দিন যাবৎ নিজেদের হেফাযতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সপ্তসিন্ধু সেঁচে তাদের আরো এক মহা আবিষ্কার, তিনি নাকি 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র তাত্ত্বিক নেতা'! এই হল আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর কীর্তি! জানিনা এদেশের জনপ্রশাসনে যারা কাজ করেন, তারা কোন্ বিদ্যা-বুদ্ধি, কোন্ পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করেন। কোন্ বিবেকে তারা একটি সুশৃংখল প্রশিক্ষিত বাহিনীর সদস্য হয়ে রাস্তার মূর্খের মত জনগণের জানমাল নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলেন। জনগণের সেবক হয়ে কিভাবে শিশুসুলভ কল্পকাহিনী বানিয়ে মানুষের উপর মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেন। আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহিতার ভয় না করেন, কমপক্ষে নিজের বিবেকের কাছে জওয়াবদিহিতার তো একটা দায় আছে। এইটুকুও যদি তারা হারিয়ে ফেলেন, তবে এ সমাজকে স্রেফ পশুর সমাজ ভাবা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

'গুড গভর্নেন্স'-এর দরকার নেই, ন্যূনতম পক্ষে মনুষ্যত্বের পরিচয়টা কিছুটা অক্ষুণ্ন রাখুক প্রশাসন, এটুকুই শুধু কামনা। নিজ দেশে বাস করাটাকে যেন অভিশাপ না ভাবতে হয় আমাদের। অপরাধী যদি হই গ্রেফতার করুন, শাস্তি দিন, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু বিনা কারণে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে এইভাবে হয়রানী করে মযলূমের অভিশাপ কুড়াবেন না। গত সরকারের সময় আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে যারা যতটুকু হয়রানী করেছিল, তাদের প্রত্যেকের ভয়াবহ পরিণতি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

*-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*
*সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক*
*বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।*

**(দুই)**

প্রথম যখন মুযাফফর ভাইকে গ্রেফতারের কথা শুনি তখন আমি দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারে লিফটে ছিলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। আর তখনই তার ব্যাপারে মনের মাঝে এক অশনি সংকেত অনুভব করছিলাম। অনেক ভাইয়েরা বলেছিল, হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিবে! আমি বলেছিলাম, ২০০৫ সালে বিগত জোট সরকারের আমলেও **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারকে এই বলেই তার বাসা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন থানায়। ফলাফল সাড়ে ৩ বছর বিনা অপরাধে মিথ্যা মামলায় জেল খাটা।

গ্রেফতারের ২ দিন পর জানতে পারলাম মুযাফফর ভাইকে আদালতে চালান করা হয়েছে। অথচ আইনে আছে কাউকে সন্দেহ করে আটক করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে চালান করে দিতে হয়। আমার আশংকা আরও ঘনীভূত হল। জানলাম তাকে নূরুল ইসলাম ফরূকী ছাহেবের হত্যাকারী বা হত্যার প্ররোচনা দানকারী সন্দেহে ২ দিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে পুলিশ ।

এদিকে কোন কোন মিডিয়া আবার আলুর গুদামে আগুন লাগলে যেমন কিছু পাবলিক পানি নিয়ে আসার বদলে হাতে করে লবণ নিয়ে আসে, সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারা খবর ছাপাচ্ছে যে, মুযাফফর ভাইকে নাকি 'আনসারুল্লাহ বাংলা টীমের' তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে গ্রেফতার করেছে। লা'নাতুল্লা-হি 'আলাল কা-যিবীন! মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়ুক। অথচ ফরূকী হত্যা মামলায় যে কয়জনকে তার পরিবার আসামী করে মামলা করেছে, সেই লিস্টে মুযাফফর ভাইয়ের নাম নেই! তাহলে কি যে কাউকে 'সন্দেহ' নামক রাজনৈতিক ফায়দা লোটার শব্দটি ব্যবহার করে গোয়েন্দারা যে কোন সময় গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নিয়ে যেতে পারে? আর 'আনসারুল্লাহ বাংলা টীমের নেতা' বলে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা থেকে যে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, আমি আশা করি সরকার টাকা দিয়ে 'আবাল' পালে না। অন্তত গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা এটা ভালো করেই জানে যে, বাংলার মাটিতে যেসব ধর্মীয় সংগঠন আছে তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? আর বাকী থাকল, ফারূকী হত্যার ব্যাপারে মুযাফফর ভাইয়ের সম্পৃক্ততা। আমরা বলব, কোন আহলেহাদীছ আলেম এরকম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন তো করেন-ই না, বরং এরকম চরমপন্থামূলক কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে সর্বদা সতর্ক করে থাকেন। তাহলে উনার ব্যাপারে কি ভুল তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা? আশা করি এমনটিই হবে। তাছাড়া জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থী তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর রয়েছে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও অপ্রতিরোধ্য লেখনী।

আল্লাহপাক যেন অচিরেই তাদের চোখের সামনে থেকে এই ভুলের পর্দা দূর করে দেন। আর যদি সরকারের কিংবা কোন গোয়েন্দা কর্মকর্তার অন্তরে দূরভিসন্ধি থাকে, তাহলে হক্বপন্থী আলেমেদের ব্যাপারে যেন আল্লাহপাক তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। কেননা আল্লাহ্ই উত্তম পরিকল্পনাকারী, ওয়াল্লা-হু খায়রুল মা-কেরীন!

পরিশেষে সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং মুযাফফর ভাইয়ের শুভাকাংখীদের উদ্দেশ্যে বলব, অন্যান্য সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতার করলে আমরা বাংলাদেশের সমাজে যে চিত্র দেখতে পায়, তারা

সেরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেননি। এটা প্রশংসার দাবী রাখে। কেননা এসব কাজ করা সালফে ছালেহীনের নীতি বহির্ভূত।

একসময় ডঃ গালিব স্যার বলেছিলেন, 'জেলখানাটাও দুনিয়ার একটা অংশ'। কাজেই এতে হতাশ বা ভেঙ্গে পড়ার কিছুই নেই। আল্লাহপাক মুযাফফর ভাইয়ের তাক্বদীরে যেটা রেখেছেন সেটা উনাকে পিছু করবেই। আল্লাহ যেন তাকে সকল চক্রান্তকারীর কূট-চক্রান্ত থেকে হেফাযত করেন-আমীন!

*-তালহা খালেদ*
*দাম্মাম, সঊদী আরব।*

**(তিন)**

**কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে গ্রেফতার মুযাফফর বিন মুহসিন :**
**সালাফে ছালেহীনের সুন্নাতের পুনরাবৃত্তি**

গত ৭ নভেম্বর ২০১৪ রোজ শুক্রবার রূপগঞ্জ, জুম'আর ছালাতের পর আল-জামিয়াতুস সালাফিয়াতে আমার একমাত্র চাচা 'বরিশাল মডেল কলেজে'র অধ্যাপক মুছত্বফা কামালের সাথে কথা বলছিলাম। এমনি মুহূর্তে মুহাম্মাদপুর আল-আমিন জামে মসজিদ থেকে এসে প্রবেশ করলেন ঢাকার তানভীর ভাই। হাসি মুখে সালাম-মুছাফাহা করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম; কিন্তু দীর্ঘ দিন পর সাক্ষাৎ হওয়ার পরেও তার মুখে কোনও হাসি দেখলাম না। এতে আমার হৃদয়ে একটা ধাক্কা খেল। আমি একটু অভিমান করে বললাম, রাগ করেছেন না-কি ভাই? ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন, 'মুযাফফর ভাইকে ডিবি পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গেছে'। এই কথা শুনার সাথে সাথেই মাথার উপর যেন বাজ পড়ল। বিবেক বুদ্ধির চলন্ত গতি যেন ফারাক্কার বাঁধে গিয়ে আটকে গেল। চোখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল। সকল কাজে স্থবিরতা চলে আসল ।

এটা এক মাস আগের ঘটনা। আজ অবধি শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নুরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলার ডাহা মিথ্যা অভিযোগ কাঁধে নিয়ে জেলের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিন যাপন করছেন।

আজ অতীতের স্মৃতি গুলো খুব বেশী মনে পড়ছে। এইতো সেদিন, আমি যখন নওদাপাড়া মারকাযে ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ি আর মুযাফফর ভাইয়েরা আলেমে পড়েন। আমি থাকতাম আব্বুর সাথে মাদরাসার লাইব্রেরী সংলগ্ন রুমে। সাথে থাকতেন বর্তমান মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন চাচা। তার এক রুম পরেই ২০৮ নং রুমে থাকতেন মুযাফফর ভাই। মাদরাসা থেকে যেদিন খাবার হিসাবে মাছ দিত সেদিন দেখতাম, আব্বু ঘরের ভিতর থেকে জোর ডাক ছাড়তেন, মুযাফফর! মুযাফফর!! মুযাফফর ভাই তখন রুম থেকে জি উস্তাদজি!! বলে দৌড়িয়ে চলে আসতেন। তখন আব্বু বলতেন, আব্দুল্লাহ্‌র মাছের কাঁটা বেঁছে দাও তো! আমি মাছের কাঁটা বেঁছে খেতে পারতাম না। কারণ তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তখন মুযাফফর ভাই সাথে করে তার রুমে নিয়ে মাছের কাঁটা বেঁছে দিতেন। তখন থেকেই বুঝতাম আব্বুর প্রিয় ছাত্রদের একজন হচ্ছেন মুযাফফর ভাই। আরো দেখতাম যখন তখন মুযাফফর ভাই বিভিন্ন বই নিয়ে আব্বুর কাছে চলে আসতেন কিছু বুঝে নেয়ার জন্য। আব্বুকেও দেখতাম ছোটখাট প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় মুযাফফর ভাইকে ডাকতেন। মুযাফফর ভাইও আন্তরিকতার সাথে আব্বুর কথা শুনতেন। উস্তাদ শাগরেদের, ছাত্র শিক্ষকের এই সম্পর্ক যত বড় হয়েছি ততই দেখেছি মধুর থেকে মধুরতর হতে এবং সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে।

এমনকি আব্বু মুযাফফর ভাইকে বক্তব্যের জগতে তার সঙ্গী করে নিলেন। যেখানে তিনি যেতে পারেন না সেখানে মুযাফফর ভাইকে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে মুযাফফর ভাই বক্তব্যের জগতেও আব্বুর পূর্ণ সঙ্গী হয়ে গেলেন। আব্বুর লেখা ফাতাওয়ার প্রুফ এবং বিশেষ করে রেফারেন্স ঠিক করে দিতেন মুযাফফর ভাই। আমাদের আরেক জন বয়োবৃদ্ধ উস্তাদজি শায়খ বদিউযযামান (রহঃ)-এরও ফাতাওয়া ঠিক করে দিতেন মুযাফফর ভাই। আস্তে আস্তে তিনিও ফাতাওয়া লেখা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে আল্লাহ্‌র রহমতে দুই জনের একসাথে যাওয়া হল পিস টিভিতে। এমনকি পিস টিভির পক্ষ থেকে প্রত্যেক বক্তাকে একটি করে ঘড়ি পুরস্কার দেয়ার অনুষ্ঠানে যখন আব্বুর নামই সর্ব প্রথম ঘোষণা করা হয় তখন আব্বু উপস্থিত না থাকায় সেই পুরস্কার উপস্থিত বিভিন্ন আলেমের দাবীতে তার ছাত্র হিসাবে মুযাফফর ভাই গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে ছাত্র-শিক্ষকের এই জুটি অল্প দিনের মাঝেই সারা বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের মাঝে ভালবাসার পাত্র পরিণত হয়ে গেলেন।

আজ অতীতের এই স্মৃতিগুলো নিজেকে খুব কাঁদাচ্ছে। আব্বুকেও দেখলাম ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি সবাইকে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে তার এই প্রাণ প্রিয় ছাত্রের জন্য দো'আ করতে বলছেন। বাসাতে আম্মাকে ফোন করেও দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে মুযাফফর ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে বললেন।

শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন শুধু আমার বড় ভাই নন বরং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকও বটে। আমি তার কাছে প্রায় ৬/৭ মাস ইবনে মাজাহ পড়েছি। বড় ভাই হিসাবে তার স্নেহ যেমন ছিল অতুলনীয় তেমনি শিক্ষক হিসেবে তিনি ইলম বিতরণে ছিলেন অকৃপণ। অন্যদিকে তার নেতৃত্বের গুণের কথা সংগঠনের কোনও কর্মীই অস্বীকার করতে পারবে না। আজ যখন এই রকম একজন পরম স্নেহশীল বড় ভাইয়ের উপর হত্যার মত জঘন্য মামলার মিথ্যা অভিযোগ দেখি তখন বিবেক মস্তিষ্ক দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হৃদয়টা হয় ক্ষত-বিক্ষত!

**ফারূকীর পরিচয় :**

সুধী পাঠক! যেহেতু মুযাফফর ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ফারূকী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে, সেহেতু ফারূকী এবং তার হত্যা বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারূকী ১৯৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর পঞ্চগড় যেলার বড়শশী ইউনিয়নের নাউতারী নবাবগঞ্জ গ্রামে মাওলানা জামসেদ আলীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে প্রথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন তিনি। নীলফামারী যেলাধীন ডোমার থানার অন্তর্গত তিনিহাটি জামেউল উলুম সিনিয়র মাদরাসা থেকে ১৯৭৫ সালে দাখিল পরবর্তীতে আলিম পাস করেন। ১৯৭৯ সালে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক ছারছিনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদরাসা (বরিশাল) থেকে কামিল (হাদীছ বিভাগে) ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৮১ সালে নীলফামারী সরকারী কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিই 'চ্যানেল আই'য়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'কাফেলা'র উপস্থাপক ছিলেন। জন্মগত ভাবে তিনি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম ফের্কা 'ব্রেলভী রিজভী' ফির্কার অনুসারী ছিলেন। যারা ফিক্বহী দিক দিয়ে দেওবন্দীদের মত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মুকাল্লিদ হলেও মূলতঃ তাদের অন্যতম মূল পার্থক্যকারী মাসআলা হচ্ছে তিনটি। যথা- (১) রাসূল (ছাঃ) সর্বত্র বিরাজমান (২) রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন (৩) অলী-আওলিয়ার কবরে নযর-নেয়ায দেওয়া, তাদের অসিলায় কিছু চাওয়া সবই নেকীর কাজ। অথচ ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণ সর্বদা তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

যাহোক নুরুল ইসলাম ফারূকী মাঠ পর্যায়ে ব্রেলভীদের মাঝে সেই রকম খুব একটা জনপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু মিডিয়া জগতে তার ছিল সরব পদচারনা। তিনি মিডিয়াতে এসে নিজ আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি হননি বরং তা আরো জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন ।

গত ২৭ আগস্ট রোজ বুধবার ফারূকীর ব্যক্তিগত সহকারী মারুফ হোসেনের বরাত দিয়ে ছোট ছেলে মাদরাসা শিক্ষার্থী আহমেদ নূরী প্রথম আলোকে বলেন, রাত আটটার দিকে প্রথমে দুই ব্যক্তি এসে কলিংবেল বাজায়। ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে বলা হয়, তারা হজ্জে যাবে, এ জন্য হুজুরের কাছে এসেছে। দরজা খুলে তাদের বসার ঘরে বসানো হয়। ফারূকী বাইরে যাবেন জানিয়ে যা বলার দ্রুত বলতে বলেন। যুবকেরা জানায়, তাদের লোকজন যারা হজ্জে যাবে, তারা বাইরে আছে। তারা ফোন করে সাত-আটজনকে ডেকে আনে। একপর্যায়ে তারা প্লাস্টিকের রশি দিয়ে মারুফের হাত-পা বেঁধে ফেলে। তিনজন ফারূকীর গলায় চাপাতি ঠেকিয়ে টাকা দাবি করে। একপর্যায়ে তারা ফারূকীর হাত বেঁধে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যায়। তারা পাশের ঘরে ফারূকীর দ্বিতীয় স্ত্রী, শাশুড়ী ও গৃহকর্মীসহ অন্যদের হাত-পা রশি দিয়ে ও মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে।

আহমেদ নূরী বলেন, রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁর বড় ভাই ফয়সাল দরজা খোলা পেয়ে বাসায় ঢুকে প্রথমে বসার ঘরে থাকা মারুফের বাঁধন খুলে দেন। পরে খাবার ঘরে গিয়ে তাঁদের বাবাকে গলা কাটা ও নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। উল্লেখ্য যে, খুনিরা ওই বাসায় থাকা অবস্থায় সেখানে যান ময়মনসিংহ থেকে আসা মাওলানা শফিকউল্লাহসহ তিনজন। শফিকউল্লাহ জানান, তাঁরা দরজায় টোকা দিলে দুই ব্যক্তি দরজা খুলে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে তাঁদের বসার ঘরে নিয়ে বেঁধে ফেলে ও মুখে কাপড়ের টুকরা গুঁজে দেয়। তখন ফারূকী পাশের ঘর থেকে আর্তনাদ করে বলছিলেন, তাঁর কাছে নগদ টাকা নেই, ব্যাংকে আছে। তখন দুর্বৃত্তদের একজন বলে, তাহলে পাঁচ লাখ টাকা থাকার খবর কি ভুল? এরপর তিনি পাশের ঘর থেকে আর কোনো শব্দ পাননি। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা তাঁদের তিনজনের কাছ থেকে ছয় হাযার টাকার মতো নিয়ে চলে যায়। পরে ফারূকীর ছেলে ফয়সাল ঢুকে তাঁদের বাঁধন খুলে দেন। *(বিস্তারিত দ্র. দেখুন : দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০১৪)*। এই ছিল তাকে হত্যার দিনের ঘটনা।

অতঃপর উক্ত ঘটনা মিডিয়াতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সন্দেহ জনক হিসাবে মাহমুদা নামক একজন মহিলাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু প্রশাসন কেসের কোনও সুরাহা করতে পারেনি। অবশেষে তারা গত ৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার জুম'আর খুৎবার পর মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ।

**ফারূকী হত্যা এবং ঘটনার মোটিভ পরিবর্তন ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা :**

নুরুল ইসলাম ফারূকীর হত্যার পর সর্ব প্রথম যে প্রতিক্রিয়া তার ছেলের মুখ থেকে আসে তা হচ্ছে এটি ছিল একটি ডাকাতির ঘটনা। যা ইউটিইউব-এ আছে। তার মৃত্যুর বিষয়ে আরো ধারণা কর হয় যে, তার দুই স্ত্রীকে নিয়ে পারিবারিক কোনও দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে অথবা তার হজ্জ কাফেলার টাকা পয়সা নিয়ে কারো সাথে কোনও সমস্যা ছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু হঠাৎ করে ঘটনার দুই একদিন পর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ঘটনার মোটিভ চেঞ্জ করে বক্তব্য আসে। আর হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে আদর্শিক দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের মুসলিমরা কোনোদিন মাযহাবী কারণে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। পৃথিবী ব্যাপী মুসলিম দেশ গুলোতে মাযহাবী কারণে দ্বন্দ্ব লাগলে তা মূলতঃ শী'আ ও সুন্নী কেন্দ্রীক হয়ে থাকে এবং বর্তমানে এই শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের আগুনের শিকার পাকিস্তান, সিরিয়া ইরাক সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। বিশেষ করে আমাদের নিকটবর্তী দেশ পাকিস্তানে মাযহাবী দ্বন্দ্ব আজ রক্ত ঝরা ডাল ভাতের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সচেতন মহল মাত্রই জানেন সেখানে এখনও ব্রেলভী কবরপুজারী বনাম আহলেহাদীছ বা আহলেহাদীছ-দেওবন্দী বা দেওবন্দী-ব্রেলভী দ্বন্দ্বের রক্ত ঝরেনি। আর বাংলাদেশে তো শী'আ সুন্নী দ্বন্দ্বের কোনও নযীর নেই সেখানে ব্রেলভী-আহলেহাদীছ তো অনেক দূরের কথা। আর আমাদের দেশে বরং মাযহাবী দ্বন্দ্বের চেয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে অহরহ রক্ত ঝরছে। লীগ-জামায়াত, বিএনপি-লীগ দ্বন্দ্ব তো এদেশের অস্তিতের সাথী হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে মাযহাবী দ্বন্দ্ব, ব্যস! শুধু কথা ও কলমের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আর যদি কোনও দিন হয়ও তাহলে তার জন্য পরিবেশ লাগবে। কিন্তু সেই পরিবেশ বাংলাদেশে আজও তৈরি হয়নি আল-হামদুলিল্লাহ। আর নুরুল ইসলাম ফারূকীর পূর্বে সেই পরিবেশ তো কল্পনাই করা যায় না। এই জন্যই তো তার ছেলে এই ঘটনাকে কোনও মাযহাবী দ্বন্দ্বের ফল বলেনি। কেননা এদেশের ধর্মীয় পরিবেশ যা, তাতে এটা তার মাথাতেই আসতে পারে না। অন্যদিকে দেশের সচেতন আলেম সমাজ জানেন যে, পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে নীল নকশায় মুসলিম দেশগুলো গৃহ যুদ্ধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনে বাংলাদেশকে পুড়ানোর মত কোনও খড়ি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নাই। কেননা এই দেশে বসবাসকারী সকল মানুষের মুখের ভাষা বাংলা, জাতিগত ভাবে এই দেশে শুধু মুসলিম বাঙ্গালীরাই বসবাস করে। আর এই দেশে মাযহাবী দ্বন্দ্বও প্রকট নয়। সুতরাং কোনও ইস্যুতেই এই দেশে গৃহ যুদ্ধের আগুন লাগানো সম্ভব নয়। তাই মাযহাবী পরিবেশকে উত্তপ্ত করে এদেশে আরাজকতা সৃষ্টি করার প্লানেরও একটা অংশ হতে পারে নুরুল ইসলাম ফারূকীর কেসকে ভিন্ন দিকে ঘুরানো।

অতএব আলেম সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে, যাতে করে তাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে অসাধু মহল এই দেশে কোনরূপ ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে।

**মুযাফফর ভাই সহ আহলেহাদীছগণ চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের কঠোর বিরোধী :**

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, পৃথিবী ব্যাপী জঙ্গী তৎপরতার অংশ হিসাবে চরমপন্থায় বিশ্বাসী কেউ কী শুধু আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে এই কাজটি করে থাকতে পারে? অথচ এই সম্ভাবনার চোরাগলির সুযোগ নিয়ে একটি মহল এই জঙ্গী জুজুকে কাজে লাগিয়ে ফারূকী হত্যার দোষ আহলেহাদীছ আলেম শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিনের উপর চাপাতে চাচ্ছে।

কিন্তু আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আহলেহাদীছগণের আদর্শিক দ্বন্দ্ব যতটা না ব্রেলভীদের সাথে আছে তার চেয়ে বেশী আছে এই চরমপন্থী জঙ্গীবাদী আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তিদের সাথে। আহলেহাদীছ সংগঠন সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।

তাছাড়া এই চরমপন্থীদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস খণ্ডনে সামনের সারিতে ছিলেন শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি। আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষক এবং বিশ্ব নন্দিত ইসলামিক দাঈ ডাঃ জাকির নায়েকের পিস টিভি বাংলার

নিয়মিত আলোচক। তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য, যেখান থেকে বাংলাদেশের মাটিতে সর্ব প্রথম জঙ্গীবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার হয়েছে। শুধু এই ফতোয়াই নয় স্বয়ং মুযাফফর ভাই ২০০৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'মিছবাহ ফাউণ্ডেশন' ও 'আমার দেশ' কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ৬ হাযার প্রবন্ধের মধ্যে 'ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান' শীর্ষক ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লেখা তার প্রবন্ধ ১ম স্থান অধিকার করে। অতঃপর তিনি ঢাকা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৫ শতাধিক আলেম ও মনীষীদের উপস্থিতিতে ক্রেষ্ট ও ২০,০০০/- (বিশ হাযার) টাকায় পুরস্কৃত হন। সেই ক্রেস্ট আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বড় ভাই মুযাফফর বিন মুহসিন ছিলেন জঙ্গীবাদী অপতৎপরতার কট্টর বিরোধী। এছাড়া তার লেখা 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বমাতে দ্বীন' বইটি জ্বলন্ত সাক্ষী যে, ভাই মুযাফফর বিন মুহসিন ছিলেন জঙ্গীদের গলার কাটা, চরমপন্থী তৎপরতার আতংক।

এরপরেও আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলোতে প্রচার করা হচ্ছে, তিনি না-কি জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র তাত্ত্বিক নেতা!! যার রয়েছে সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদ'আত এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাহসী কণ্ঠ তাকে আজ জঙ্গী সংগঠনের সাথে জড়ানো হচ্ছে!! হায়রে সাংবাদিক! হায়রে অথর্ব প্রশাসন, ধিক! পরিশেষে বলব আল্লাহ তা'আলাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক তাই আল্লাহ্র কাছে আমরা এর সুবিচার প্রার্থনা করছি।

**সংবাদ ও কেসের সূত্র বিশ্লেষণ :**

মুযাফফর ভাইয়ের গ্রেফতারের পর আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যম গুলোর বিকৃত চেহারা আরেকবার উন্মোচিত হয়। যেমন-

১. মুযাফফর ভাইকে ডিবি পুলিশ নিয়ে যায় ৭ নভেম্বর শুক্রবার জুম'আর পর। আর পত্রিকা ও নিউজ চ্যানেল বলেছে শনিবারের দিন দিবাগত রাতে! *(নয়াদিগন্ত ৯/১১/২০১৪)*।

২. ডিবি পুলিশ মুযাফফর ভাইকে সন্দেহ ভাজন আসামী হিসাবে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু নিউজ চ্যানেলগুলো ঢালাওভাবে প্রচার করেছে যে, তিনি না-কি ফারূকী হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা।

৩. কিছু পত্রিকা এবং নিউজ চ্যানেল নির্লজ্জের মত লিখেছে ও প্রচার করেছে যে, 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র তাত্ত্বিক নেতা *(আলোকিত বাংলাদেশ, ১০-১১-২০১৪)*। আবার কখনো বলে 'আহলে হাদিসে'র নেতা। হলুদ সাংবাদিকরা এটা বুঝল যে, কবরপুজারী এবং আহলেহাদীছের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু এই সত্য ধামা চাপা দিতে তাদের বুক কাপল না যে, জঙ্গী ও আহলেহাদীছের মধ্যেও আদর্শিক দ্বন্দ্ব আছে। ধিক! শত ধিক!! এই সাংবাদিকদের।

৪. মুযাফফর বিন মুহসিন ভাই না-কি ফারূকীর বিরুদ্ধে উগ্রতামূলক বক্তব্য দিয়েছে। আফসোস আপনারাও বক্তব্যটি শুনে দেখতে পারেন সেখানে মুযাফফর ভাই বলেছেন, 'এই দাজ্জালকে সরকার ধরে না কেন?' ব্যস!! শুধু এই একটি কথায় তিনি তার বিরুদ্ধে বলেছেন আর বাকি যেগুলো বলেছেন সেগুলো দেওয়ানবাগীকে লক্ষ্য করে বলেছেন। এই একটি কথায় মানুষ মানুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে দিল? বাহ! বাহ! কী মেধাবী সাংবাদিক !! আচ্ছা আমাদের দেশে যে, প্রতিদিন শত মানুষ শত মানুষের বিরুদ্ধে বলছে, রাজনৈতিক দলের নেতাদের দিকেই দেখেন না তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যেভাবে কাঁদা ছুড়াছুড়ি করছে, তাহলে কি এদের এক পক্ষের কেউ মারা গেলেই আপনি আরেক জনকে দায়ী করবেন। তাহলে বলব, বাক স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা দাড় করান না কেন! না-কি বাক স্বাধীনতা কাকে বলে তাই বুঝেন না।

৫. যদি বলা হয় শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন নিজে হত্যা করেছেন। তাহলে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সেদিন শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন ঘটনাস্থলে ছিলেন অন্য কোথাও ছিলেন না। আর যদি বলা হয় মুযাফফর ভাই এই হত্যার নির্দেশ দাতা তাহলে এটা প্রমাণ করার দু'টি পথ। যথা- (১) তার নির্দেশের অডিও-ভিডিও ক্লিপ। (২) যেই ব্যক্তি নুরুল ইসলাম ফারূকীকে হত্যা করেছে সে বলবে যে, মুযাফফর বিন মুহসিন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমটির কোনও অস্তিত্ব ক্বিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রমাণ করার জন্য আগে আসল হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে হবে। সুতরাং আসল হত্যাকারী গ্রেফতার না করে শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিনকে প্রমাণ বিহীন অত্র হত্যার নির্দেশদাতা হিসাবে গ্রেফতার দেখানো সত্যিকারভাবে এই দেশের আদালাত ব্যবস্থাকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে। আমরা এহেন মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং ধিক্কার জানায় বৃটিশ প্রবর্তিত জঞ্জালপূর্ণ তথাকথিত এই আইনের।

**সালাফে ছালেহীনের সুন্নাতের পুনরাবৃত্তি :**

মিথ্যা অভিযোগে জেলে যাওয়া শুরু করেছিলেন ইউসুফ (আঃ) সেই সিলসিলা আজও চলছে। ইমাম আহমাদ জেলে গেছেন, ইমাম আবু হানিফা জেলে মারা গেছেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ৮ বার জেল খাটার পর জেলেই মারা গেছেন। আর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কত শত আহলেহাদীছ আলেম যে, আন্দামানের কালো দ্বীপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তার কোনও ইয়ত্তা নাই। আর নিকট অতীতে গত ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার সহ অনেক আহলেহাদীছ আলেম ও নেতাকে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। আজ সালাফে ছালেহীনের নির্যাতন ভোগ করার এই সিলসিলার যাত্রী হয়েছেন বড় ভাই শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন ।

বাতিল সব সময় হক্বকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়, ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু জয় সব সময় হক্বের হয়েছে। পরাজয় বরণ করেছে বাতিল। আর বাতিলতো পরাজয় হওয়ারই যোগ্য।

শায়খ মুযাফফর বিন মুহসিন কোনদিন হরতাল, গাড়ি ভাংচুরের আদেশ দেননি। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেননি। নিজেদের পক্ষে ভোট ভিক্ষা করে কারো রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগিদার হতে যাননি। তাহলে তার উপর এই অত্যাচার ও মিথ্যা মামলার কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা বাংলার মাটিতে দ্বিধাহীন চিত্তে কুরআন ও হাদীছের কথা বলেছেন। দ্বীনী হক্বের দাওয়াত দিয়েছেন নির্ভয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে। কাউকে পরোয়া করেননি। হক্ব প্রচার করতে কোন ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রকে তোয়াক্কা করেননি।

ইনশাআল্লাহ আহলেহাদীছদের জেল হোক, জুলুম হোক, ফাঁসি হোক কুরআন ও ছহীহ হাদীছের এই দাওয়াত কোনদিন বন্ধ হবে না। মানুষের ষড়যন্ত্র মহান আল্লাহ্র সাহায্যের সামনে ধুনিত তুলার ন্যায় আকাশে উড়বে। এক ইবনে তাইমিয়াকে জেলে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু তার দাওয়াতকে হত্যা করা যায়নি। আজ তার উত্তরসূরী মুযাফফর বিন মুহসিনকেও গ্রেফতার করে এই দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না। এক ইবনে তাইমিয়া মারা গেলে শত ইবনে তাইমিয়া তৈরী হবে। আমরা আমাদের প্রাণ থাকা পর্যন্ত দ্বীনের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করে রাখবোই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন!

*[লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*
*ফাযিল, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।]*

# আইকিউ

*[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০ জানুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]*

**কুইজ ১/৮ (১) :**

১. শী'আরা কতটি হাদীছ জাল করেছে?
২. ইমাম ইবনু তায়মিয়ার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা কতটি?
৩. ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?
৪. কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত কয়টি?
৫. টিপাইমুখ বাঁধের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
৬. 'মাউযূ'আত' গ্রন্থটি কার লেখা?
৭. 'বালাকোট আন্দোলন' কাদের দ্বারা প্রচালিত হয়েছিল?
৮. আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী ছাহেব আহলেহাদীছ আন্দোলনের কয়টি মূলনীতির কথা বলেছেন?
৯. 'আল্লাহ্র রজ্জু' বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে?
১০. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' কত শতকে বিশেষ মতবাদে রূপ লাভ করে?
১১. 'হামাস' ও 'ফাতাহ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত?
১২. চার খলীফার খেলাফতকাল মোট কত বছর?
১৩. কোন্ শতাব্দীকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
১৪. মক্কা ঘোষণায় কোন্ মুসলিম দেশ স্বাক্ষর করেনি?
১৫. রাসূলের মৃত্যুর কত বছর পর কারবালা সংগঠিত হয়?

**গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :** ১. ৬ জন ২. মুছ'আব বিন উমায়ের ৩. হানযালা (রাঃ) ৪. উযহিয়্যাহ ৫. ইবরাহীম (আঃ) ৬. ১৯১৪ সালের ২৮ জুন ৭. স্টালিনের ৮. এটি ইহূদীদের একটি আন্দোলন। ৯. ইহূদীদের একটি সংবাদ সংস্থা ১০. শাহ অলিউল্লাহ ১১. পাঁচ বছর ১২. ১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ ১৩. হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ ১৪. সেমিটিক জাতি ১৫. দেড় হাযার কি.মি।

**কুইজ ১/৮ (২) :**

১. ছালাত অর্থ কী?
২. ছালাত কখন ফরয হয়?
৩. প্রথমে কয় ওয়াক্ত ছালাত ফরয ছিল?
৪. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কবে ফরয হয়?
৫. জুম'আ কোন্ ছালাতের স্থলাভিষিক্ত?
৬. ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারীর বিধান কী?
৭. সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান কোন্টি?
৮. 'মসজিদে যেরার' কাকে বলে?
৯. ছালাতের নিষিদ্ধ স্থান কয়টি?
১০. ছালাতের শর্তাবলী কয়টি?
১১. ছালাতের স্তম্ভ কয়টি?
১২. ছালাতের আবশ্যিক পূর্বশর্ত কী?
১৩. টাইলস ও চুন দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে কী?
১৪. 'নিয়ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
১৫. 'মুনাজাত' শব্দের অর্থ কী?

**গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :** ১. বাবেল শহরে ২. কালেডীয় ৩. তাওহীদের ৪. স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত। ৫. যথাক্রমে ৮০-৮৫ ও ৭০-৭৫ বছর ৬. মিনায় ৭. ইবরাহীম (আঃ)-কে ৮. চারশত বছর ৯. অন্যূন ৮৬ বছর ১০.২৫ টি সূরায় ২০৪টি আয়াত ১১. তাক্বওয়া ১২. তিনটি ১৩. দু'টি, ইসমাঈল ও ইসহাক্ব ১৪. একজন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ১৫. ইবরাহীম (আঃ)-এর।

**গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম :** ১. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) ২. মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ৩. জুনায়েদ আহমাদ (চট্টগ্রাম)।

**বর্ণের খেলা ৩/৮ :**

**নির্দেশনা :**

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে মুসলিমদের মৌলিক কাজের নাম জানা যাবে।

১ :.....
২ :.....
৩ :.....
৪ :.....

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....

**সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৮:**

**নির্দেশনা :**

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

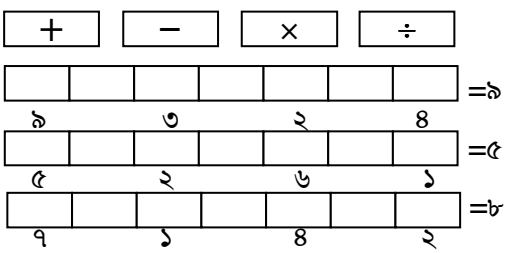


**গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর :** (১) ৯÷৩×৪−৭=৫ (২) ৬÷২+৫−১=৭ (৩) ২×৪−৩×১=৬

***[উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*